ভাষাতত্ত্ব

বাংলা ভাষা-বর্ণনার ভূমিকা

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের বিষয় ভাষা এবং ভাষাতত্ত্ব। দুটোকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার সংগত কারণ রয়েছে। ভাষা মানুষের মুখের জিনিস, সামাজিক জীবনে যে সকল বিচিত্র আচরণের মধ্যে সে নিজেকে ব্যাপৃত রাখে ভাষা তারই একটা বিশিষ্ট প্রকাশ। চলাফেরার মতোই ভাষা একটি মানবিক আচরণ যা সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং সেই পরিমাণে সাক্ষাৎ পর্যবেক্ষণ এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের অধীন। ভাষার যে তাৎপর্য ইন্দ্রিয়াতীত আমাদের সীমিত আলোচনায় তা অগ্রাহ্য। অপরপক্ষে, ভাষাতত্ত্ব একান্তভাবে ভাষাবিজ্ঞানীর ভাষা। ভাষাকে বর্ণনা করার একটা কৌশল মাত্র। ভাষাবিজ্ঞানীর নিজের প্রয়োজনে নির্মিত এ এমন একটি হাতিয়ার যাকে আশ্রয় কবে তিনি ভাষা সম্পর্কে তাঁর ইন্দ্রিয়লব্ধ ধ্যানধারণাকে নিপুণভাবে ব্যক্ত করতে পারেন। অন্যান্য বিজ্ঞানবিদ্যার সঙ্গে ভাষাবিজ্ঞানের এই একটা প্রধান পার্থক্য। বর্ণিত বিষয় ও বর্ণনার মাধ্যম দুইই এখানে এক অর্থাৎ ভাষা। উভয়ের মধ্যে এই অপরিহার্য ঐক্য তত্ত্বের দিক থেকে কিছু অহেতুক জটিলতার সৃষ্টি করেছে। এ সম্পর্কে গোড়া থেকে সতর্ক থাকা ভালো।

আমাদের বর্ণনার মূল বিষয় বাংলা ভাষা। এবং সেই সঙ্গে ভাষাতত্ত্বের যেসব বিশিষ্ট নীতিনিয়ম সূত্রপদ্ধতি এই বর্ণনাকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দান করার জন্যে অনুসৃত হয় তার কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করা।

একটা পুরনো তর্কের কিছু নতুন জবাব পাওয়া গেছে, সেই কথাটা তোলা যাক। ভাষাতত্ত্বটা কি সত্যি বিজ্ঞান ? সত্তর-আশি বছর আগে আক্রমণটা এসেছিল ফিললজিস্টদের ওপর। তাঁরা নাকি অনুমানের অলীক সিঁড়ি বেয়ে ভাষার বিবর্তনকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন। এবং সেই অনুমানের ধারাবাহিকতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করলে তাদের কাছে স্বরবর্ণতো ছার ব্যঞ্জনবর্ণেরও মান পাওয়া ভার ছিল। এই অভিযোগের অবসান ঘটেছে প্রাচীন ভাষাসমূহ থেকে প্রচুর প্রমাণাদি সংগৃহীত হবার পর এবং একাধিক লুপ্ত ও অজানিত ভাষার পুনরুদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে। কালের স্রোতে ভাষায় যে ধ্বনি বিবর্তন ঘটে সে সম্পর্কে বহু সাধারণ সূত্র এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। একাধিক ভাষার ক্ষেত্র থেকে নজির তুলে সেগুলোর প্রয়োগ কুশলতা প্রমাণ করা এখন কঠিন নয়।

ইতোমধ্যে ভাষাতত্ত্বের নিজের সাধনার ক্ষেত্রও বিস্ময়করভাবে প্রসার লাভ করেছে। তাতে নতুন প্রাণ সৃষ্টি হয়েছে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্চারিত হয়েছে। নানা শাখায় বিস্তার লাভ করে গণিতশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদিকে আত্মসাৎ করে সে নতুন নতুন পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। ভাষাতত্ত্ব বলতে আগে বোঝাত কেবলমাত্র ঐতিহাসিক বা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বকে। তার লক্ষ্য ছিল কোনো ভাষার জন্ম বৃদ্ধি বিস্তারকে নিপুণ শৃংখলার সঙ্গে বিচার করা, ক্রমবিকাশের ধারায় কোনো গ্রন্থি হারিয়ে গিয়ে থাকলে তার পুনর্গঠন করা, অন্য ভাষার সঙ্গে তুলনা করে তার বংশ বিচার করা। বংশ পরিচয়ের জয়টিকা আজকাল সমাজে যেমন সন্ত্রাসিত শ্রদ্ধা বা আকর্ষণ লাভ করে না, ভাষাবিজ্ঞানীরাও তেমনি হালে কোনো ভাষার চতুর্দশ পুরুষের পরিচয় উদ্ধার করাটাকে তাঁদের সাধনার

একমাত্র লক্ষ্য বলে মনে করেন না। অতীত ও বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করার চেয়ে বর্তমান ও প্রত্যক্ষকে বর্ণনা করার দিকেই তাঁদের মুখ্য প্রবণতা।

এই বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের বিশ্লেষণ পদ্ধতি আলোচনা করা এ গ্রন্থের অন্যতম লক্ষ্য। মানববিদ্যাসমূহের মধ্যে বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব অনেক কারণে বৈজ্ঞানিক বলে অভিহিত হওয়ার দাবি রাখে। মানবাচরণের অন্যতম অঙ্গ ভাষাকে এই বিজ্ঞান ন্যূনতম বিভাজ্য খণ্ডে বিশ্লেষিত করে সেই অংশসমূহের সংযোজনধর্মকে বর্ণনা করে। শুদ্ধাশুদ্ধ বিচারের নির্দেশনামা তৈরি করে না। কোন্‌টা উচিত আর কোন্‌টা অনুচিত, মনগড়া আদর্শের কৃত্রিম ভিত্তিতে সেটা বিচার করতে উদ্যোগী নয়। মূল্য বিচার করে দণ্ডনীতি জারি করা সে ছিল প্রাচীন ও প্রচলিত ব্যাকরণের রেওয়াজ। বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব আধুনিক ব্যাকরণের বুনিয়াদ গড়েছে। তার মূল বাণী হলো এই যে, শুরু করতে হবে ভাষা থেকে, কোনো ধরাবাঁধা সূত্র থেকে নয়। বর্ণনাই কেবলমাত্র উদ্দেশ্য এবং যা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করা যায় কেবলমাত্র তারই বর্ণনা করা। যে ভাষা মুখে মুখে প্রকাশ লাভ করে সামাজিক মানুষের জীবনযাত্রাকে সম্ভব করে তুলেছে সেই মৌখিক ভাষাই আধুনিক ভাষাতত্ত্ববিদের চোখে সবচেয়ে মূল্যবান। মুখের বাণীই অগ্রগণ্য। কালিকলমে লিখিত ভাষা তারই পরোক্ষ রূপায়ণ মাত্র। এই অর্থে লিখিত ভাষা প্রতীকের প্রতীক। বাকধ্বনির প্রবাহকে আমরা নির্দিষ্ট ভাব বা বস্তুর প্রতীক বলে গ্রহণ করি, তাতেই ভাষার সৃষ্টি। এই শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনি প্রতীককে বোঝাতে যখন আবার দর্শনীয় রেখা প্রতীক প্রয়োগ করতে শুরু করলাম তখন থেকে জন্ম হল লেখার। ভাষার ধ্বনিগত রূপ বা মুখের প্রকাশটাই ভাষাতত্ত্ববিদদের বিচারে অপেক্ষাকৃত মৌলিক ও মুখ্য অনুমিত হয়।

যে বাংলাকে ঘিরে আমাদের আলোচনা তা কথ্য বাংলা। ভৌগোলিক বাংলা। ভৌগোলিক মাপকাঠিতে এই বাংলার জন্ম পশ্চিমবঙ্গে এবং সকল শিক্ষিত বাংলা ভাষাভাষীর বাঙালি এই বাংলাকে আদর্শ সাধারণ চলতি বাংলা বলে গ্রহণ করেছেন।

বৈজ্ঞানিক সততা বজায় রাখতে হলে এইখানে আরো একটা স্বীকারোক্তি থাকা দরকার। মার্জিত কথ্যবুলির যে ব্যবহারিক রূপ আমাদের দুজনের মুখে কানে স্বভাবত প্রচলিত কেবলমাত্র তাকে বর্ণনা করতেই আমরা উদ্যোগী হয়েছি। যাঁরা অন্যরকম বলেন শোনেন তাঁদের ব্যাখ্যায় এবং আমাদের ব্যাখ্যায় কিছু সূক্ষ্ম ভেদ দৃষ্ট হওয়া বিচিত্র নয়। এ নিয়ে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। যেহেতু আমরা একই ভাষা বর্ণনা করছি, এরকম সামান্য প্রভেদে মূল বক্তব্যের ওলট-পালট হবে না।

বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের বৈজ্ঞানিকতা এইখানে আরো স্পষ্ট। বর্ণিত বিষয়ের বিশিষ্ট অবস্থা ও পরিবেশ বিস্তৃতভাবে ও নিঃসংশয় রূপে উল্লিখিত থাকা চাই। যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তার সীমাবদ্ধ প্রয়োগ ক্ষেত্রকেও যেন জাজ্বল্যমান রূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হই, এত সতর্কতা সেই উদ্দেশ্যে।

আরো একটা জিনিস লক্ষ করার মতো। ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও প্রকৃতির একাধিক আধুনিক ভাষাতত্ত্ববিদ একেবারে নিজে থেকে স্বাধীনভাবে বিশ্লেষণ করে কোনো এক বিশেষ নতুন ভাষার বর্ণনা করেছেন, মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, সকল বর্ণনার আসল কথাগুলো মোটামুটি একই। মার্কিন ও রুশ ভাষাতত্ত্ববিদের লেখা আরবি বা তুর্কি ভাষার বর্ণনামূলক ব্যাকরণে মৌলিক বিরোধিতা নেই। উভয়েই কোনো প্রাচীন ব্যাকরণ নকল করেছেন সেই

জন্যে নয়। এর কারণ হলো এই যে, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব তার বিশ্লেষণরীতিকে চুলচেরা যুক্তিবিচারে দাঁড় করিয়েছে, সিদ্ধান্তকে প্রমাণ-নির্ভর রেখেছে। ভাষা সম্পর্কে কোনো সূত্রই আপ্তবাক্যের উপর নির্ভর করে গ্রহণ করেন নি। বিশ্লেষণের ক্রমিক পদক্ষেপকে সুনির্দিষ্ট যুক্তির বাঁধনে এঁটে দিয়েছেন। বিশ্লেষণের রীতি নির্ধারক প্রতিটি সংজ্ঞা সুচিন্তিত, সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত, অপরাপর সংজ্ঞার সঙ্গে তার সম্পর্ক সুগ্রথিত, প্রয়োগ পর্যায়ে সেগুলোর ধারাবাহিকতা সুনির্ধারিত। এই কারণে কেবলমাত্র সাধারণ বুদ্ধি খাটিয়ে ভাষাবিজ্ঞানের সকল কথার তাৎপর্য গ্রহণ করা যাবে ভাবা ঠিক নয়। ভাষাতাত্ত্বিকের বিশেষ উদ্দেশ্য কী, তার বর্ণনীয় উপাদানের স্বরূপ কী, প্রতি স্তরে অনুসৃত রীতিপদ্ধতির তত্ত্বগত বুনিয়াদ কী— এ সব কথা খেটেখুটে বুঝে নিতে হবে। নইলে ভাষাতত্ত্ববিদের সঙ্গে ভাষাভাষীর নানারকম অকারণ ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে।

ভাষার ধ্বনিময় প্রবহমান সত্তাকে পরিপূর্ণ উপলব্ধি করার জন্যে, ভাষাতত্ত্বে ভাষাকে অণুতম বোধগম্য খণ্ডে বিভক্ত করে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ রচিত হয়। এই প্রকার ক্রমবর্ধমান খণ্ডাংশের পর্যায়ক্রম বজায় রেখে এই গ্রন্থের পরিচ্ছেদসমূহ গ্রথিত হয়েছে।

এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদ, বাক্‌ধ্বনির বর্ণনা। কোনো বিশেষ ভাষার বাক্‌ধ্বনি নয়, যে কোনো মানুষের কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত যে কোনো ভাষায় যত রকমের সম্ভাব্য ধ্বনি ব্যবহৃত হতে পারে তার পরিচয়। এ রকম ধ্বনি নিশ্চয় অগুণ্তি, তাব সবটা বর্ণনা করা অসম্ভব। তবে নানা রকম শ্রেণীতে ভাগ করে নানারকম ছকে ফেলে সেই ধ্বনিবৈচিত্র্যের নানা সীমানা অনুমান করা যায়। কিছু মাপকাঠিও নিরূপণ করা যায়, যাকে আশ্রয় করে যে কোনো নতুন ধ্বনির জাতবিচার সহজ হয়, তার স্বকীয় রূপ প্রায় নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ বাক্‌ধ্বনির বর্ণনাকে সীমাবদ্ধ করে বিশেষ ভাষার গণ্ডির মধ্যে টেনে নেওয়া হবে। বিচার্য বিষয় বিশেষ ভাষার মধ্যে কোন কোন ধ্বনি তাৎপর্যপূর্ণ, বাক্‌ধ্বনির কী ন্যূনতম পার্থক্যের জন্যে সেই ভাষায় অর্থভেদ ঘটে ইত্যাদি। প্রথম পরিচ্ছেদ যদি থাকে phone-এর আলোচনা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হবে phoneme বিচার। ফোনের প্রতিশব্দ ধ্বনি। ফোনিমের কোনো প্রতিশব্দ বাংলায় নেই। ধ্বনিম বলতে যদি সকলের আপত্তি না থাকে তা গ্রহণ করা চলতে পারে। আমরা ইংরেজি শব্দ ফোনিমই ব্যবহার করেছি, কদাচিৎ ধ্বনিম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ morphology বা রূপতত্ত্ব। অর্থাৎ ধ্বনিসমষ্টি যে স্তরে অর্থপূর্ণ শব্দের বা শব্দাংশের আকার নিয়েছে। কী নিয়মে শব্দ-শব্দাংশ পরস্পরের সঙ্গে গ্রথিত হয়, ধ্বনির কী সামান্য পরিবর্তনে মূল অর্থের আংশিক পরিবর্তন ঘটে, ইত্যাদির পরিচয়। নিয়মটা ওপর থেকে চাপানো হয়েছে, এমন নয়। সেটা বৈচিত্র্যের মধ্যে আবিষ্কার করা হয় মাত্র, যাকে অবলম্বন করে সে বৈচিত্র্যের স্বরূপ বোধগম্যরূপে প্রকাশ করা যায়। এই স্তরে ভাষার বস্তুগত প্রকাশের দিক—অর্থাৎ তার ধ্বনিরূপ, ভাবের দিক অর্থাৎ তার অর্থরূপের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে বাক্যরীতি।

গ্রন্থের বাকি অংশে আঞ্চলিক ভাষা, শিক্ষায় ভাষাতত্ত্বের প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

ধ্বনিরূপ তত্ত্ব

ধ্বনির রূপ বিচার করা এই পরিচ্ছেদের বিশেষ উদ্দেশ্য। কোনো বিশেষ ভাষার অপরিহার্যরূপে ব্যবহৃত বিশিষ্ট ধ্বনিসমূহ বর্ণনা করার আগে, মানুষ মাত্রই নানা দেশে নানা ভাষায় কথা বলতে গিয়ে মুখ দিয়ে যত রকম আওয়াজ বের করে থাকে সে সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণা গড়ে নেয়া দরকার। যে শাস্ত্র সকল রকম সম্ভাব্য বিচিত্র বাক্‌ধ্বনির বর্ণনায় উদ্যোগী তাকেই ইংরেজিতে phonetics বলে। আমরা বাংলায় তাকে ধ্বনিতত্ত্ব বলে থাকি। ধ্বনিরূপ তত্ত্ব বললে হয়ত আরো ভালো হয়, কারণ ধ্বনির ভাষাগত তাৎপর্য নয় কেবলমাত্র তার শ্রবণগ্রাহ্যরূপের শারীরিক বর্ণনাই হলো এই শাস্ত্রের লক্ষ্য। দুটো ধ্বনির মধ্যে অতি সামান্য পার্থক্য যদি কোনো বিশেষ ভাষায় অর্থগত কোনো তাৎপর্য বহন নাও করে, ধ্বনিরূপের তত্ত্বালোচনায় সে তুচ্ছ পার্থক্যকেও প্রকট করে তুলতে হবে। এরকম দুরূহ বর্ণনায় প্রয়াসী হওয়ায় সার্থকতা এইখানে যে এতে করে স্বকর্ণে শোনার ক্ষমতাটা আর নিতান্তই অনুমান বা অভ্যাসের দাস হয়ে থাকে না। কানের পর্দাটা সরকারি ঘোষকের ঢোলের পরিবর্তে ওস্তাদ বাজিয়ের তবলায় পরিণতি লাভ করে। ধ্বনির সূক্ষ্মতম তারতম্যও তখন জাজ্বল্যমানরূপে অনুভূত হয়। নির্বিশেষে বাক্‌ধ্বনির অন্তহীন রূপগত বৈচিত্র্য সম্পর্কে যখন এরকম সুস্পষ্ট এবং সম্পূর্ণ ধারণা জন্মে তখনই বিশেষ ভাষায় গ্রাহ্যবিশিষ্ট বাক্‌ধ্বনিসমূহের ভাষাগত সত্তার, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা সহজ হয়। অবশ্য এখানে একটা মস্তবড় প্রশ্নের মুখোমুখি না হয়ে উপায় নেই। নানা ভাষার নানা লোকের নজির দূরে থাক, একই ব্যক্তি একই কথা যখন দুবার উচ্চারণ করে তখন সে দুটোও কি সকল দিক থেকে হুবহু এক রকম হয়? প্রাণপণ চেষ্টা করলেও কি হতে পারে? বিজ্ঞানাগারের গবেষক দুটো নমুনাকেই যন্ত্রে গ্রহণ করে বিশ্লেষণে করে বলতে চান যে সে রকম হওয়া প্রায় অসম্ভব। সূক্ষ্ম বিচারে প্রবেশ করলে একই কথার একাধিক উচ্চারণেও প্রতিবারেই কিছু না কিছু অমিল লক্ষ করা যাবে। এবং তাই যদি হয় তাহলে বাক্‌ধ্বনির অগুণতি রূপভেদ নিঃশেষ বর্ণনা করা কোনদিনই সম্ভব হবে না। ভাব-ভাষা নিরপেক্ষ এই অর্থে বাক্‌ধ্বনির সামগ্রিক রূপ বর্ণনা সব সময়েই অসম্পূর্ণ, আংশিক এবং সীমাবদ্ধ।

Phonetics নিজের শাস্ত্রের সম্পূর্ণতা লাভের অপারগতা সম্পর্কে সচেতন। আধুনিক ধ্বনিরূপ তত্ত্ব এইজন্যে স্বেচ্ছায় নিজের বিচারাধীন এলাকার গণ্ডীকে নানা দিক থেকে সীমিত করে দিয়েছে। সকল সম্ভব অসম্ভব স্বতন্ত্র বাক্‌ধ্বনির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তারতম্য নির্ণয়ের পরিবর্তে আধুনিক ধ্বনিরূপ তত্ত্ব সমগ্র বাক্‌ধ্বনিকে নানা সাধারণ শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের রূপগত জাতবিচারে প্রবৃত্ত হয়েছে। নানা শ্রেণীর অন্তর্গত অনিরূপিত সংকীর্ণ ভেদাভেদ, অবস্থা বিশেষে বিস্তৃতরূপে পরিমাপযোগ্য বলে উহা রেখে দেয়। কিন্তু এই সীমিত শ্রেণীকরণের অন্তর্নিহিত মূলনীতির মধ্যে এমন ইঙ্গিত থাকা চাই যাকে অবলম্বন করে বিস্তৃত বৈচিত্র্যকে অনুমান করা যায়। যার কাঠামোকে আশ্রয় করে সমগ্রকে উপলব্ধি করা যায়, যার মানদণ্ড আরোপ করে মিহি ও মোটা সকল আওয়াজের স্বরূপ বর্ণনা করা সম্ভব হয়।

ভাবের মতো ধ্বনি দেহহীন নয়। ধ্বনি মাত্রই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। তার একটা পদার্থগত অস্তিত্ব আছে যা প্রত্যক্ষত পর্যবেক্ষণযোগ্য। তার বর্ণনা প্রধানত তিনটে দৃষ্টিকোণ থেকে শুরু করা যেতে পারে। প্রথমত ঠোঁট-জিব-গলার নানা রকম কারসাজির ফলে বাক্‌ধ্বনির সৃষ্টি হয়। এই সব মানবাঙ্গের ব্যবহারভেদে ধ্বনি-বৈচিত্র্যের প্রকাশ। সকল রকম ধ্বনিকে তার

সৃষ্টিকারী শারীরিক ক্রিয়াকৌশলের ভিত্তিতে বর্ণনা করা চলতে পারে। ধ্বনিরূপ তত্ত্বের এই অংশ দেহবিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত বাকধ্বনিকে বিচার করা চলতে পারে কেবলমাত্র তাব বাহন বায়বীয় ধ্বনিতরঙ্গের রূপে বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে। ভাষাতত্ত্বের এই এলাকা পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তৃতীয়ত বাক্‌ধ্বনির রূপ ব্যাখ্যা চলতে পারে শ্রোতার কানে কোন ধ্বনি কী রকম বাজে সেই ধারণাকে ভিত্তি করে। এই শেষোক্ত বিচার বিজ্ঞানসম্মত নৈর্ব্যক্তিকতাকে বজায় রেখে এগোয় না। সাধারণ বুদ্ধিপ্রসূত ব্যক্তিগত অনুমান বা স্বকীয় স্নায়ুগত বোধশক্তির ওপর অতিরিক্ত আস্থাবান। আমাদের ধ্বনিরূপের এই আলোচনা বাক্‌ধ্বনির শারীরিক কারণ উৎসকে প্রধান বর্ণিতব্য বিষয় বলে মেনে নেবে। অবশ্য অনেক ভাষাতত্ত্ববিদ আছেন যারা কেবল ধ্বনির বায়ুতরঙ্গকে বিশ্লেষণ করে ধ্বনির রূপ বিচার করাটাকেই সবচেয়ে বেশি লাভজনক এবং বৈজ্ঞানিক বলে মনে করেন। এখানে আমাদের প্রয়াস অত সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক না হলেও বহুল পমিাণে নির্ভরযোগ্য এবং কার্যকরী। এ কথা সত্য যে, মোটামুটি একই ধ্বনি দুজন মানুষ, বা একই ব্যক্তি, একাধিক উপায়ে উচ্চারণ করতে পারে। যে কোনো পেশাদার হরবোলা এ কথা প্রমাণ করতে সক্ষম। তবুও সাধারণভাবে, গলা থেকে ঠোঁট পর্যন্ত মুখের ভেতরের নানা অংশের ভিত্তি কবে বিভিন্ন শ্রেণীর বাক্‌ধ্বনির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা অসঙ্গত নয়। এ রকম বর্ণনাব জন্যে প্রথমে জীববিদ্যা থেকে কিছু প্রয়োজনীয় নামধাম সংগ্রহ করে নেয়া দরকাব এবং সেই সঙ্গে বাক্য উচ্চারণের যন্ত্র হিসেবে আমাদের গলা ও মুখ কিভাবে কাজ কবে তার পরিচয় নেয়া যাক। বাক্য উচ্চারণের শরীর-ক্রিয়া, মানবদেহের অন্যান্য ক্রিয়াব মতোই জটিল। তবে আমাদের ধ্বনিরূপ বর্ণনার স্পষ্টতার জন্যে এই জটিল ক্রিয়াপদ্ধতির বিস্তৃত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। কেবল যে কয়েকটি অংশ বাক্‌ধ্বনির বৈচিত্র্যকে নিয়ন্ত্রিত করে, তাদের স্বরূপ জানলেই চলবে। মুখেব যেসব অংশ এ ব্যাপারে প্রধান সেগুলো হলো—ঠোঁট, জিব, দাঁত, মাড়ি, তালু, আলজিব, নাসাপথ, গলবিল, স্বরযন্ত্র, স্বরতন্ত্রী, ফুসফুস। এগুলোর মধ্যে কোনোটা সক্রিয়, কোনোটা নিষ্ক্রিয়। এগুলোর মধ্যে ঠোঁট, জিব আর স্বরতন্ত্রী খুবই সক্রিয়। Phonetics-এর পাঠ্য বইতে কী কারণে জানি না সব সময়েই বাম দিকে মুখ ফেরানো একটা নক্‌সা এঁকে এগুলো চিহ্নিত করে দেয়া থাকে। যেমন—

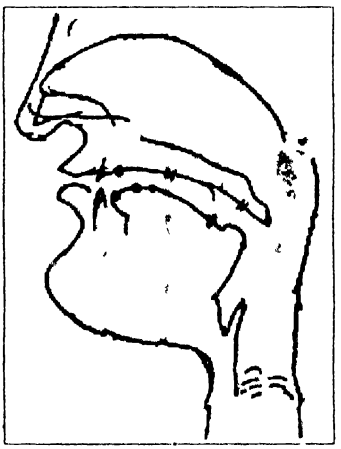

মানুষ 'গলার আওয়াজটাকে ঠোঁটে, দাঁতে, জিবে, টাকরায়, নাকের গর্তে, ঘুরিয়ে ধ্বনির পুঞ্জ গড়ে তোলে'। ধ্বনির জাত বিচার করার সময় তাই উচ্চারণের স্থান যাচাই করা একটা প্রকৃষ্ট পন্থা। ফুসফুসের হাওয়া যখন সাধারণ অবস্থায় আসা-যাওয়া করে তখন কোনো ধ্বনির সৃষ্টি হয় না। যখন কোনোরকম বাধা পায় তখনই ধ্বনির জন্ম। এই বাধার স্থানকেই আমরা ধ্বনির উচ্চারণ-স্থান বলছি। বলা বাহুল্য বাধা সৃষ্টিকারী অঙ্গাংশ একটি নয়, একাধিক। অনেক ক্ষেত্রে তার একটি সচল, অন্যটি অচল এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই বাধার স্থানের সচলাংশ নিচে এবং অচলাংশ ওপরে থাকে। কোনো ধ্বনির নামকরণের সময় যে কোনো

একটাকে মাত্র উল্লেখ করা হয়। বাধার স্থান বা উচ্চারণ-স্থান যদি ঠোঁট হয় তবে তাকে আমরা বলি ওষ্ঠধ্বনি। যেমন প। এখানে ঠোঁটে ঠোঁট মিলেছে। দুটোই সচল। আবার সচল নিচের ঠোঁট অচল দাঁতের সঙ্গে যুক্ত হয়েও ধ্বনি সৃষ্টি করতে পারে। যেমন ইংরেজির ফ। এ জাতের ধ্বনিকে বলব দন্তৌষ্ঠ্য।

জিব মিলতে পারে দাঁত, মাড়ি ও তালুর সঙ্গে। জিবের আবার নানা অংশ রয়েছে। যেমন জিবের ডগা, জিবের পাতা, জিবের মাঝখান এবং জিবের মূল। এমনি করে তালু বা টাকরাকেও ভাগ করা চলে সম্মুখ, মধ্য ও পশ্চাৎভাগে। তালুর সামনেরটা এবং মধ্যভাগ শক্ত কিন্তু পেছনের অংশ অতি নরম। এই নরম তালুর পরেই নিচের দিকে ঝুলন্ত লক্‌লকে ক্ষুদে মাংসের ফালিটি হলো আলজিব। নরম তালুর অপর পিঠ ওপরের দিকে নড়তে পারে এবং ইচ্ছেমতন ঠেলে উঠে নাসাপথ বন্ধ করে দিতে পারে। জিবের ডগা যখন দাঁতের সঙ্গে মেলে তখন আমরা তাকে বলি দন্ত্যধ্বনি। মাড়ির সঙ্গে বা তালুর সম্মুখভাগের সঙ্গে যুক্ত হলে বলি দন্তমূলীয়। যেমন, ত দন্ত্যধ্বনি, কিন্তু ট দন্তমূলীয়। জিবের ডগা কুঁকড়ে বেঁকিয়ে যখন মধ্যতালুকে স্পর্শ করে তখন মূর্ধন্য ধ্বনির সৃষ্টি হয় যেমন ট। জিবের স্থিতিস্থাপকতা যতই থাকুক না কেন জিবের ডগার পক্ষে বাঁকা হয়ে উল্টে তালুর একেবারে পশ্চাদভাগ অর্থাৎ নরম তালুর নাগাল পাওয়া কঠিন। জিবের পাতা দন্তমূলে বা তালুর সামনে ভাগে মিলতে পারে। এবকম শ হলো তালব্য বা অগ্রতালু জাতীয়। জিবের পেছনের অংশ আর তালুর পেছনের অংশ মিলে বাধা সৃষ্টি করলে পাই জিহ্বামূলীয় ধ্বনি।

উচ্চারণ বা বাধার স্থানের ভিত্তিতে এই কয়েকটি মোটামোটা ভাগে বিভিন্ন শ্রেণীর বাক্‌ধ্বনিকে ভাগ করা যায়।

ধ্বনির শ্রেণীকরণের আরেকটিতে হলো উচ্চারণরীতি। বাধার স্থান এক হয়েও উচ্চারণরীতি স্বতন্ত্র হওয়ার ফলে ধ্বনি ভিন্নরূপ ধারণ করতে পারে। যেমন ত আর ন দুটোই স্থানের দিক থেকে ভেদহীন, অর্থাৎ উভয়েই দন্ত্যধ্বনি কিন্তু পৃথক হয়েছে রীতি আলাদা বলে। এইখানে বাধা বা উচ্চারণের স্থান বলে আমরা এতক্ষণ যে অবস্থাকে ধরে নিয়েছিলাম, সে কথাটার আরো খুঁটিয়ে যাচাই করে নেয়া দরকার। বাধার স্থান বলতে এমন মনে হয় যেন, স্থানটা কোনো এক বিশেষ বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত, অন্য সর্বত্র অপরিবর্তনীয়রূপে অবাধ এবং বাধা সৃষ্টি হয়েছে দুটো অঙ্গাংশের সম্পূর্ণ সংযোগের ফলে। এ ধারণাটা শুধরে নেয়া দরকার। মুখের ভেতরের চলমান বায়ুস্তম্ভ মুক্তিলাভের চেষ্টায় যেখানে সবচেয়ে বেশি বাধা পাচ্ছে, ধাক্কা খাচ্ছে বা চাপ খাচ্ছে সে মুখ্য বিঘ্নকারী এলাকাকেই আমরা উচ্চারণস্থান বলে অভিহিত করেছি। মুক্তিপথ আচমকা বন্ধ হওয়ার জন্য ধ্বনি সৃষ্টি হতে পারে, রুদ্ধ পথ আচমকা খোলার জন্যেও ধ্বনি উৎপাদিত হতে পারে, বায়ুপথের বিশেষ অংশ সংকীর্ণ হয়ে বা কেঁপে উঠেও ধ্বনি উৎপাদিত হতে পারে, বায়ুপথের বিশেষ অংশ সংকীর্ণ হয়ে বা কেঁপে উঠেও ধ্বনি-সৃষ্টিকারী বিঘ্ন তৈরি করতে পারে। মুখ্য বাধা স্থান ছাড়াও অন্য অঙ্গাংশের রকমারি কারাসাজির কারণেও ধ্বনিবৈচিত্র্য ঘটে। এই রীতিবহুলতার সীমানা যাচাই করা হলো বাক্‌ধ্বনির শ্রেণীকরণের দ্বিতীয় পন্থা। এক এক করে উচ্চারণ স্থানের মতো এই রীতির বিভিন্নতা এখন দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করা যাক।

রীতি-বৈষম্যের ফলস্বরূপ সবার আগে যে দু'জাতের বাক্‌ধ্বনি নজরে পড়ে তাদের রূপ-বৈপরীত্য এত মৌলিক যে উভয়ের বিশ্লেষণ স্বতন্ত্রভাবে না করে উপায় নেই। এক শ্রেণীর

নাম ব্যঞ্জনধ্বনি, অপরটি স্বরধ্বনি। স্বরযন্ত্রে অবস্থিত স্বরতন্ত্রীর কম্পন হেতু যে ধ্বনিপ্রবাহ সৃষ্টি হয় তা যদি মুখের ভেতরে কোথাও আটকা না পড়ে কোনো সংকীর্ণ পথে ঘর্ষণলাভ না করে অবাধে মুখের মধ্যপথ দিয়ে, কখনও বা একই সঙ্গে নাক দিয়ে, বেরিয়ে যায় তবে তাকে স্বরধ্বনি বলি। যেহেতু এই ধ্বনিপ্রবাহ মুখের মধ্যে পুরাপুরি আটকা পড়ে না, পীড়িত হয় না, স্বরধ্বনির রূপাকারে তারতম্য ঘটে অনুনাদক মুখগহ্বরের আভ্যন্তরীণ আয়তনের নানারকম ইচ্ছাকৃত পরিবর্তনের ফলে। স্বরধ্বনির নানা রূপ প্রকার বিষয়ে আমরা পরে বিস্তৃত আলোচনা করব। আগে ব্যঞ্জনধ্বনির পরিপ্রেক্ষিতে বাক্‌ধ্বনির রীতিগত বিশ্লেষণে অগ্রসর হওয়া যাক।

শ্বাসনালী যেখানে গলায় এসে শেষ হয়েছে সেই মাথায় স্বরতন্ত্রী অবস্থিত। পাতলা ঠোঁটের মতো দু'ফালি স্থিতিস্থাপক মাংসপেশীতে গড়া। সাধারণ অবস্থায় স্বরতন্ত্রী শিথিল থাকে। দু'ফালি মাংসপেশীর মাঝখানের ফাঁকটি তখন বড়। শ্বাসনালীতে বাতাস এই পথে অবাধে আসা-যাওয়া করতে পারে। কোনো ধ্বনির সৃষ্টি হয় না। কিন্তু যখন ব্যক্তির ইচ্ছায় এই স্বরতন্ত্রীতে টান পড়ে, মাংসপেশীর ফালি তখন আর শিথিল হয়ে এলিয়ে পড়ে থাকে না। শক্ত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়। বাতাসের চাপে সম্পূর্ণ যুক্ত হতে পারে না কিন্তু মধ্যের ফাঁক খুবই সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। এই সংকীর্ণ পথ ঠেলে বাতাস যখন বেরিয়ে যেতে চায় তখন স্বরতন্ত্রী থরথর করে কাঁপতে থাকে। এই কম্পনের ফলে যে সুরময় ধ্বনি সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় স্বর বা নাদ। অন্য কোনো বাধাস্থানে উৎপাদিত ধ্বনি যেমন স্বরহীন হতে পারে তেমনি স্বরযুক্তও হতে পারে। স্থান এবং রীতির দিক থেকে অভিন্ন হয়েও দুটো ধ্বনি এই স্বগুণে নিজেদের প্রভেদ ঘোষণা করতে পারে। স্বরহীন ধ্বনিকে বলা হয় অঘোষ ধ্বনি, স্বরযুক্তকে ঘোষ। এই ঘোষ-অঘোষ রীতিভেদ প্রায় সকল ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যেই লক্ষ করা যাবে।

কয়েক জাতের স্বরহীন বা স্বরযুক্ত ধ্বনিকে আরো একটা রীতিগতভাবে ভাগ করা যায়। সে হলো ধ্বনি বিশেষের সঙ্গে স্বরতন্ত্রীর ঘর্ষণজাত কোনো দমকা হাওয়ায় ধাক্কা দিয়ে বার হয় কিনা। এ দমকা হাওয়ার অতিরিক্ত ঝোঁকটাকে বলে প্রাণ। লিখে বোঝাতে গেলে বলতে হয় যে, যে-কোনো ধ্বনির সঙ্গে একত্রে যদি হ উচ্চারিত হয় তবেই তাকে প্রাণযুক্ত বলা যেতে পারে। এই রীতি অনেক ভাষায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত বলে বাকধ্বনিকে প্রাণহীন ও প্রাণযুক্ত এই শ্রেণীতে বিচার করা প্রয়োজনীয়। ধ্বনিরূপতত্ত্বে বাংলায় প্রাণহীন ধ্বনিকে বলা হয় অল্পপ্রাণ, প্রাণযুক্তকে মহাপ্রাণ।

ধ্বনির রীতিগত রূপ বিচারে এই স্বর ও প্রাণ যে ভেদ সৃষ্টি করে, তার একটা বিশিষ্ট তাৎপর্য রয়েছে। এই ভেদ প্রায় যে-কোনো স্থানের যে-কোনো রীতির ক্ষেত্রেই আরোপিত হতে পারে। এই অর্থে স্বর ও প্রাণ মৌলিক রীতির সূক্ষ্মতর শ্রেণী সূচিত করে।

উচ্চারণরীতির দিক থেকে শ্রেণীকরণ করতে গেলে এর পরই যে প্রধান মানদণ্ডের উল্লেখ করতে হয়। সে হলো বাধার স্থানের বিশেষ ক্রিয়া বা অবস্থা। যেমন, শ্বাসনালী থেকে বাতাস বেরিয়ে আসবার সময় হঠাৎ মুখের মধ্যে কোনো স্থানে পলকের জন্য আটকা পড়ে মৃদু বিস্ফোরকের সঙ্গে মুক্তি পেলে তাকে আমরা বলি স্পৃষ্ট ধ্বনি। অবশ্য মুখের মধ্যে বায়ুপ্রবাহ হঠাৎ আটকা পড়লেও স্পৃষ্ট ধ্বনি সৃষ্ট হতে পারে। বাংলা প, স্পৃষ্ট ওষ্ঠ্য ধ্বনি, ক স্পৃষ্ট জিহ্বামূলী ধ্বনি।

মুখ্য বাধার স্থান যদি সম্পূর্ণরূপে যুক্ত না থেকে ঈষৎ বিযুক্ত থাকে যাতে সে সংকীর্ণ পথ দিয়ে বেরুতে গিয়ে বায়ুপ্রবাহ হঠাৎ বাধা পায় না কিন্তু ঘর্ষিত ও পীড়িত হয় তাহলে সেই ঘর্ষণজাত ধ্বনিকে বলে উষ্ম বা শিস্‌জাত ধ্বনি। বাংলা হলো উষ্ম তালব্য ধ্বনি। এই বর্ণ স্বরতন্ত্রীর পেশীদ্বয় থেকে শুরু করে দুঠোঁট পর্যন্ত যে-কোনো স্থানে সৃষ্টি হতে পারে। স্বরতন্ত্রীর কম্পিত বা অকম্পিত পেশীদ্বয়ের সংকীর্ণায়ত রন্ধ্রপথে পীড়িত বায়ুপ্রবাহ যে শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনির সৃষ্টি করে তাকে বলে উষ্ম কণ্ঠ্যধ্বনি। যেমন বাংলা হ। ইরেজি ফ হলো উষ্ম ওষ্ঠ্য ধ্বনি উষ্ম ধ্বনি তার উচ্চারণরীতির কারণেই স্পৃষ্ট ধ্বনির মতো ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য নয়। ইচ্ছে মতোন টেনে তার প্রলম্বিত ধ্বনিকরণ সম্ভব। শিস্‌জাত ধ্বনি কখনো-কখনো সোজা প্রবাহিত না হয়ে সংকীর্ণায়ত স্থানের এক পাশ বা দুপাশ দিয়ে বেঁকে বার হতে থাকে। এরকম ধ্বনিকে বলা যেতে পারে পার্শ্বস্থ উষ্ম ধ্বনি। যখন সংকীর্ণায়ত মুখ্য বিঘ্নস্থল পাশাপাশি লম্বিত তখন তাকে বলব লম্বিত উষ্ম এবং ওপর নিচে খাঁজ কাটা হলে তাকে বলব নালীয়। বাংলা তালব্য শ নালীয় উষ্ম কিন্তু কণ্ঠ্য হ লম্বিত। হ জাতীয় ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রীর পেশীদ্বয় টানা পড়ে প্রসৃত পরস্পরকে চেপে ধরতে চায়।

এক বিশেষ শ্রেণীর স্পৃষ্টধ্বনি আছে যার বায়ুপ্রবাহ বাধার স্থানে পূর্ণ বাধায় আটকা পড়েই সঙ্গে সঙ্গে এক দমকে মুক্ত হয় না। অপেক্ষাকৃত ধীরে পথমুক্ত হয়। অনেকটা ঘর্ষণজনিত উষ্মধ্বনির মতো। এ জাতীয় ঘর্ষিত স্পৃষ্টধ্বনির নাম ঘৃষ্ট। এক অর্থে স্পৃষ্টধ্বনির মৌলিক বা একক ধ্বনি নয়। এ ধ্বনি গড়ে ওঠে কোন স্পৃষ্ট ধ্বনির সঙ্গে সমস্থানীয় উষ্ম ধ্বনির যুগ্ম উচ্চারণে।

গলার শব্দ যদি মুখ দিয়ে বার না হয়ে নাক দিয়ে বার হয় তবে তাকে বলি নাসিক্য ধ্বনি। বলা বাহুল্য নাসিক্য ধ্বনি স্বরযুক্ত। তার রূপবৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় অনুনাদক মুখগহ্বরের আয়তনকে নানা স্থানে সীমিত করে। যেমন ঠোঁট দিয়ে মুখ বন্ধ করে গলার আওয়াজ নাক দিয়ে বার করলে পাই ওষ্ঠ্য নাসিক্য ধ্বনি, ম। জিবের ডগা দাঁতে চেপে যদি নাক দিয়ে ধ্বনি সৃষ্টি করি তবে পাই দন্ত্য নাসিক্য ধ্বনি। এমনি করে মূর্ধন্য নাসিক্য ধ্বনি।

সব ধ্বনির বায়ুনির্গমন পথ মুখগহ্বরের সরল রেখাঙ্কিত মধ্যপথ নয়। সকল স্বরধ্বনি বায়ুনির্গমন পথ মুখগহ্বরের সরল রেখাঙ্কিত মধ্যপথ নয়। সকল স্বরধ্বনি ও অনেক ব্যঞ্জনধ্বনির বাধার স্থান যেখানেই হোক না কেন, মুখের ঠিক মাঝখান বরাবর তার বায়ুপ্রবাহের চলাচল। কিন্তু কিছু ধ্বনি আছে। যেখানে ধ্বনিবাহী বায়ু বরাবর মাঝপথে না চলে বাধার স্থানে বিভক্ত হয়ে দুপাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। এরকম ধ্বনিকে বলা হয় পার্শ্বিক যেমন, ল। ল উচ্চারণ করবার সময় জিবের ডগা দন্তমূল ছোঁয় আর বাধা পাওয়া হাওয়া টোল খাওয়া জিবের পাতার বিযুক্ত দুপাশ দিয়ে মুক্তি পায়।

এইখানে অর্ধস্বরের বর্ণনা প্রাসঙ্গিক। অর্ধস্বর স্বরধ্বনির সঙ্গে এইজন্যে তুলনীয় যে এ ধ্বনি উৎপাদনে মুখের কোথাও কোনো পূর্ণ বাধা সৃষ্টি হয় না বা কোনো মুক্তিপথ অতি সংকীর্ণায়ত হয়ে ধ্বনিবাহী বায়ুপ্রবাহকে পীড়িত করে শিসজাত ধ্বনির জন্ম দেয় না এবং বহির্মুখী বায়ু সরলরেখায় মুখের মধ্যপথ দিয়েই নির্গত হয়। পার্থক্য এই যে স্বরধ্বনি উচ্চারণে অনুনাদক মুখবিবরের আয়তন পরিবর্তনকারী অঙ্গসংস্থান অর্ধস্বরধ্বনি উচ্চারণে সংকীর্ণতর হয়। এবং অতি মৃদু ঘর্ষণও লাভ করে। স্বর এবং ব্যঞ্জনধ্বনির উভয় গুণ এই ধ্বনিতে বর্তে বলে একে অর্ধব্যঞ্জন বা অর্ধস্বর যে-কোনো নামে অভিহিত করা চলতে পারে।

কোনো নাম অধিকতর উপযোগী হবে তা নির্ভর করবে বিশিষ্ট ভাষায় এই ধ্বনির ব্যবহার ধর্মেব ওপর। নাসিক্য ম-কার জাতীয় ধ্বনি, পার্শ্বিক ল-কার জাতীয় এবং অর্ধস্বর ইংরেজি y-জাতীয় ধ্বনিরূপতত্ত্বে একটা সাধারণ নাম দেয়া হয়ে থাকে। এই সবগুলো ধ্বনিরই রূপবৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় পূর্ণ বাধা সৃষ্টি করে নয়। কিংবা বাধার স্থান অতি সংকীর্ণায়ত করে নয়। অনুনাদক মুখগহ্বরের আয়তন নানাস্থানে পরিবর্তিত করেই এদের রূপভেদ সূচিত হয়। এই ধ্বনিগুলোকে বলা যেতে পারে Resonants বা অনুনাদিত ধ্বনি।

কোনো কোনো সময় জিবের ডগা তালুর কোনো অংশ স্পর্শ না করে ধ্বনি উৎপাদক বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে, জিবের লক্‌লকে পাতলা ডগা বেরিয়ে আসা হাওয়ার তোড়ে যদি ফরফর করে কাঁপতে থাকে তখন যে ধ্বনি সৃষ্টি হয় তাকে বলি কম্পিত ধ্বনি। বাংলা র তার একটি উদাহরণ। অবশ্য এই কম্পন ক্রিয়া ঠোঁটের প্রান্তেও সম্ভব আলজিবের পক্ষেও সম্ভব। এই অর্থে সকল স্বরধ্বনিকেও একপ্রকার কণ্ঠ্য-কম্পিত ধ্বনি বলে অভিহিত করা অযৌক্তিক হবে না।

কোনো কোনো সময় জিবের ডগা কোনো জায়গায় স্পষ্টত যুক্ত হয়ে থেকে স্পৃষ্ট ধ্বনি উৎপাদন করে না। আবার কেঁপে কেঁপে কম্পিত ধ্বনিরও জন্ম দেয় না। এ'দুয়েব মাঝখানে তার আর একটা তৃতীয় বিশিষ্ট রীতি লক্ষ করা যায়। জিবের ডগা ক্ষণিকের জন্য একবাব মাত্র পত করে কেঁপে উঠে বা তড়িত বেগে তালুর কোনো বিশেষ বিন্দু আলগোছে স্পর্শ কবে যে ধ্বনির সৃষ্টি করে থাকে, বলি তাড়িত ধ্বনি। যেমন ড়, ঘোষ তালব্য তাড়িত ধ্বনি।

ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণীকরণের যে দুটি মূল মাপকাঠি দাঁড় করানো হলো তার ভিত্তিতে প্রায় সকল সম্ভাব্য ব্যঞ্জনধ্বনির রূপবৈচিত্র্যকে নির্দেশিত কবা যায় ৫৫৩ পৃষ্ঠাব ছকে আমরা তার একটি লৈখিক নক্‌শা চিত্রিত করছি। ডান থেকে বামে পাশাপাশি ঘবের ভাগ উচ্চাবণ স্থানের নির্দেশিক। একেবারে বাম ধারে, ওপর থেকে নিচে উচ্চারণরীতির।

আমরা আমাদের নকশায় বাংলা হরফ ব্যবহার না করে ধ্বনিতত্ত্বে বিশেষরূপে ব্যবহৃত চিহ্নদিকে স্থান দিয়েছি। তার কারণ হলো এই যে-কোনো বিশেষ ভাষায় প্রচলিত হরফাদি একাধিক ধ্বনির প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হতে বাধ্য। বর্ণতত্ত্ব পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা থাকবে। বর্তমান পরিচ্ছেদে ছকের বাইরে অন্যত্র যেখানেই কোনো বিশেষ ধ্বনিব রূপ বোঝাতে বাংলা বা ইংরেজি হরফ ব্যবহার করা হয়েছে। সেখানেই তার তাৎপর্য কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট বর্ণিত ধ্বনির বিশিষ্ট রূপার্থে গ্রহণ করতে হবে। স্বকীয় ভাষায় এই সব হরফের সাধারণ ও বিকল্পিক রূপাকার কী তা অগ্রাহ্য করে। অর্থাৎ এগুলো ব্যবহার করেছি বর্ণনাকে ব্যাখ্যা করার জন্যে, স্পষ্ট করবার জন্যে । অন্য যে-কোনো প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করলেও চরতে পারত। কেবল এতটুকু সতর্কতা প্রয়োজন যে ধ্বনিরূপতত্ত্বে একই চিহ্ন যেন একাধিক রূপের জন্য কখনও ব্যবহৃত না হয়।

৫৫৩ পৃষ্ঠায় ছক একে ধ্বনির নানারূপের বৈচিত্র্য সম্পর্কে যে ছবি তুলে ধরা হয়েছে তা নিতান্তই অসম্পূর্ণ এবং সংক্ষিপ্ত। এর সার্থকতা এইখানে যে এই কাঠামোকে সামনে রেখে যে কোনো ধ্বনির অমূল্য বৈশিষ্ট্যকে একটি মাত্র হরফ বা চিহ্ন দ্বারা ব্যক্ত করা যায়।

উচ্চারণ স্থানের যে কয়েকটি প্রধান শ্রেণী ছকে নির্দেশিত হয়েছে, প্রতি স্তরে তার আরো অনেক সূক্ষ্মতর বিভাগ সহজেই অনুমেয়। একই অংগ সংস্থান নির্দেশিত মানদণ্ডকে স্বীকার করেও এক ধ্বনির ক্ষেত্রে সামান্য সামনে, অন্যটির ক্ষেত্রে সামান্য পেছনে অবশ্যই হতে পারে। দ্ব্যর্থহীনভাবে সকল ধ্বনির বৈচিত্র্যকে বোঝাতে হলে এই ছককে আরো অন্তহীন

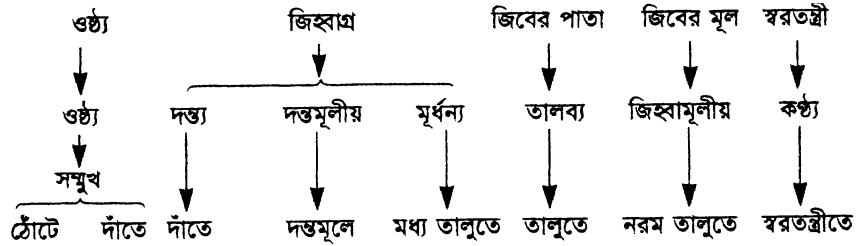

স্পৃষ্ট :

সহজ <

মহাপ্রাণ <

স্পৃষ্ট :

অল্পপ্রাণ <

মহাপ্রাণ <

উষ্ম :

লম্বিত

নালীয়

পার্শ্বস্থ

নাদিত :

নাসিক্য

পার্শ্বিক

অর্ধস্বর

তাড়িত

কম্পিত

রেখায় আকীর্ণ করে তুলতে হয়। জগতের সুপরিচিত ভাষাসমূহে মূল যে ক' জাতের ভাষা ব্যবহৃত হয় মোটামুটি তাদের কথা মনের পেছনে রেখেই এই নক্শা। একই স্থানের ধ্বনিকে অধিকতর অণুশ্রেণীতে বিভক্ত করার জন্যে আমরা কয়েকটি বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করতে পারি। যেমন, হরফের নিচে বিন্দু (.) দিলে বুঝব যে তুলনামূলকভাবে অপেক্ষাকৃত পেছনে অবস্থিত। যদি নিচে সামনমুখী ফলা < আঁকা থাকে তবে বুঝব একটু বেশি সামনে। প্রয়োজন অনুসারে এরকম সূক্ষ্মতর ভেদের অন্যান্য চিহ্নাদিও তৈরি করে নেয়া যেতে পারে। উচ্চারণরীতির দিক থেকে অনেক জটিলতা এই ছকে স্থান পায় নি। রীতির দিক থেকে কোনো স্বাতন্ত্র্যকে আমরা হয়তো এক ধ্বনির ক্ষেত্রে নির্দেশ করেছি, অন্য শ্রেণীর ধ্বনির বেলায় করিনি। যেমন অল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণ বৈপরীত্যকে আমরা কেবলমাত্র স্পৃষ্ট ধ্বনির ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছি, অন্যত্র নয়। অল্পপ্রাণ এবং মহাপ্রাণ উভয় জাতের নাদিত ধ্বনিই অর্থাৎ নাসিক্য, শিসজাত, পার্শ্বস্থ ইত্যাদি। কান সজাগ রাখলে অনেক ভাষার লোকের মুখেই শোনা যাবে। একই রকম ভাবে ঘোষ-অঘোষ পার্থক্য বিচারও স্পৃষ্ট ধ্বনিকে অতিক্রম করে অন্যান্য ধ্বনির ক্ষেত্রেও যুক্তিসংগতভাবে প্রসারিত করা চলতে পারে।

কিছু রীতিবৈচিত্র্যের কথা এ পর্যন্ত আমরা আদৌ উল্লেখ করি নি। ধ্বনির রীতিগত শ্রেণীকরণে আমরা এতক্ষণ ধরে নিয়েছিলাম যে ধ্বনিবাহী বায়ু ফুস্‌ফুস্ থেকে উঠে মুখ বা নাক দিয়ে বার হয়ে যায়। এর গতিটা বহির্মুখী। কিন্তু বাক্‌ধ্বনি অন্তর্মুখী বায়ুপ্রবাহ থেকেও উৎপাদিত হতে পারে। অর্থাৎ বার থেকে বাতাস যখন ফুসফুসের টানে জোরে মুখের ভেতর প্রবেশ করতে চায় তখন যদি কোনো উচ্চারণস্থানে বাধা পড়ে তাহলেই অন্তর্মুখী বা অন্তর্বাহী বাক্‌ধ্বনিব সৃষ্টি হয়। এই ভিত্তিতে সহজেই সকল রীতির ধ্বনিকে, অবিকল বহির্মুখী ধ্বনির বিস্তৃত শাখা-প্রশাখার মতোই বর্ণনা করা চলতে পারে। এরকম অন্তর্মুখী ধ্বনিকে কেউ চিৎকার জাতীয় ধ্বনি বলেছেন। স্পষ্ট চুম্বনে যে মৃদু বিস্ফোরণ ধ্বনি শ্রুত হয় তাকে ধ্বনিরূপতত্ত্বে অন্তর্মুখী স্পৃষ্ট ওষ্ঠ ধ্বনি রূপে অভিহিত করা চলে। বাঙালি আফসোস প্রকাশ করতে যে চুকচুক শব্দ করে সেটা দন্তমূলীয় চিৎকার। আফ্রিকার কোনো কোনো ভাষায় শীৎকার জাতীয় ধ্বনি শব্দগঠনের মৌলিক ধ্বনি হিসেবেই বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণীকরণ সম্পর্কে আলোচনা শেষ করার আগে এর রীতিগত জটিলতার আবেকটা দিক সম্পর্কে অবশ্যই আলোচনা করা দরকার। কোনো একটি উচ্চারণের সম্পূর্ণ কালব্যাপী, সে যত ক্ষণিকই হোক না কেন, কেবল একটি উচ্চারণস্থানই সক্রিয় থাকে বা আগগোড়া একটি রীতিই অনুসৃত হয় এমন ধারণা করা ভুল হবে। নানা কারণে একক উচ্চারণের সময়ে একই কালে একাধিক উচ্চারণস্থান ক্রিয়াশীল হতে পারে, একাধিক রীতি যুগ্মভাবে আরোপিত হতে পারে। এ তত্ত্বের কিছু আভাস আছে ঘৃষ্টধ্বনির বর্ণনায় । কিন্তু আরো স্পষ্ট করে এখানে বলা দরকার যে এ জাতীয় যৌগিক ধ্বনি একক ধ্বনির সঙ্গে তুল্যমূল্য। দুটো পৃথক ধ্বনি অতি দ্রুত পরপর উচ্চারণ করলেই তাকে যৌগিক ধ্বনি বলব না, দুটো ধ্বনিবৈশিষ্ট্য একই সঙ্গে উচ্চারিত হলে তখন পাই যৌগিক ধ্বনি। যেমন প-জাতীয় ধ্বনি উচ্চারণে ওষ্ঠপুটের যে মিলন ঘটে, মুখের আরো পেছনের অনেক স্পৃষ্ট ধ্বনির সঙ্গে একই কালে যুক্ত-মুক্ত হতে পারে। ভাষাতত্ত্বে হরফের মাথায় লিখে এই যৌক্তিকতা প্রকাশ করা যেতে পারে। এমনি করে জিহ্বামূলে সংযোগমুখের সামনের অন্যান্য ধ্বনির সঙ্গে সমকালে ধ্বনিত হতে পারে। ওপরে ক লিখে তা বোঝান চলতে পারে। তালব্য ছাড়া অন্য স্থানের ধ্বনির সঙ্গে তালব্য জাতীয় সংযোগ বিদ্যমান থাকলে হরফের মাথায় ই লেখা

চলতে পারে। ক° বললে বোঝাবে কণ্ঠৌষ্ঠ স্পৃষ্ট ধ্বনি, প° ওষ্ঠ্য-কণ্ঠ্য, ত° দন্ত্য-তালব্য। এমনিভাবে যৌগিক ধর্মভেদে বহুতর সম্ভাব্য ব্যঞ্জনধ্বনির বর্ণনা করা কঠিন নয়।

স্বরধ্বনির উচ্চারণে বায়ু মুখে ভেতরে কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় না, সংকীর্ণায়ত পথে পীড়িত হয় না, কোনো অংগাংশের কম্পিত প্রান্তে অনুরণন লাভ করে না। শুধুমাত্র গলায় অর্থাৎ স্বরযন্ত্রে যে ধ্বনি সৃষ্টি হয় বা অবাধে মুখের ভেতর দিয়ে বা নাকের ভেতর দিয়ে বা উভয়ের মধ্য দিয়ে বার হয়ে যায়। মুখগহ্বরের অনুনাদী আয়তনকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করে তার রূপাকারে নানা বিভিন্নতা প্রকাশ পায়। স্বরধ্বনির শ্রেণীকরণে এই জন্য মুখগহ্বরের আয়তন নিয়ন্ত্রণকারী নানা অংগাংশের আচরণকে জানা দরকার। জিব এবং ঠোঁটের অবস্থানই হলো এর মধ্যে প্রধান। জিবের কোন অংশ কতখানি উত্তোলিত এই দুই কোণ থেকে স্বরধ্বনির একটি মুখ্য বিভাগ সম্ভব। সেই সঙ্গে ঠোঁটের রন্ধ্রপথ কি প্রসৃত না বর্তুলাকার এই দুই মানদণ্ড আরোপ করে স্বরধ্বনির আরেক রকম বিচার সম্ভব। যেমন উচ্চারণের সময়ে যদি ঠোঁটের ফাঁকে পাশাপাশি বেশি চেরা না হয়ে অপেক্ষাকৃত গোলাকার আকার নেয় এবং জিহ্বামূল নামমাত্র ওপরমুখী ওঠান, তবে সে ধ্বনিক আমরা লিখতে পারি—অ। যদি ঠোঁট আরো বেশি গোলাকার হয় এবং জিবের পেছনের অংশ আরো বেশি উঁচুতে ওঠে তাহলে লিখি—ও। এমনিভাবে জিবের সামনের অংশ সামান্য উঁচু, ঠোঁট প্রসৃত থাকলে পাব এ্যা বা আ জাতীয় ধ্বনি। বাংলা শব্দে এ্যা-কার, এ-কার ও ই-কার প্রসৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি, জিবের উচ্চতা ক্রমশ ওপরে উঠেছে। বাংলা শব্দে অ-কার, ও-কার, উ-কার বর্তুল পশ্চাৎস্বর, জিবের উচ্চতা ক্রমশ উপরমুখী। স্পষ্টই লক্ষ করা যাচ্ছে যে সম্মুখ জিব ক্রমোত্তোলিত করে যখন সম্মুখ স্বরধ্বনিসমূহ উচ্চারণ করা হয়, ঠোঁট জোড়া তখন পাশ পাশ ফাঁক হয়ে থাকে। জিবের পশ্চাৎ অংশ ক্রমশ উঁচু করে যে সব পশ্চাৎ স্বর উচ্চারিত হয়, সে সব স্থলে ঠোঁট অনুপাত মতো বর্তুলাকার ধারণ করে। এই সরল ভাগের মধ্যে আরেকটা জটিল স্তর অবশ্য লক্ষণীয়। সম্মুখ স্বর বর্তুলাকার ঠোঁটে যেমন সম্ভব, তেমনি পশ্চাৎ স্বর প্রসৃত ঠোঁটেও উচ্চারিত হতে পারে। এই কারণে সম্মুখ এবং পশ্চাৎ উভয় জাতের সকল উচ্চতার ধ্বনিকেই প্রসৃত এবং বর্তুল—এই দুইভাগে শ্রেণীকরণ করা প্রয়োজনীয়। আবার সম্মুখ এবং পশ্চাৎ বলতে আমরা এতক্ষণ ধরে নিয়েছিলাম যে, স্বরধ্বনি হয় জিবের সম্মুখ ভাগ দিয়ে নয় পশ্চাৎভাগের সক্রিয়তায় রূপলাভ করে। বলা বাহুল্য, সমগ্র জিবের প্রক্রিয়া দুইভাগে ভাগ করা নিতান্তই অতি সরলীকরণ। নানা সূক্ষ্মতর বিভাগের সম্ভাব্য অস্তিত্বকে স্বীকার করে অন্তত জিবের সক্রিয় অংশকে অন্তত তিনটে মুলভাগে ফেলা দরকার—সম্মুখ, মধ্য, পশ্চাৎ। ঠোঁটের উচ্চতার ভিত্তিতে স্বরধ্বনির শ্রেণীকরণে এতক্ষণ যে তিনটে মূল ক্রমিক স্তরকে প্রধান বলে ধরে নিচ্ছিলাম তারও অসংখ্য সূক্ষ্মতর বিভাগ সম্ভব এবং স্বাভাবিক। তবে আমরা আমাদের সীমিত বর্ণনায় মৌলিক তিনটি ভাগের অন্তর্বর্তী, আরো চারটি ক্রমিক উচ্চতার স্তরকে স্বীকার করব। আমাদের বিচার্য উচ্চতার মোট সাতটি স্বর উপর, উপরনিচ, মধ্যের ওপর, মধ্য, মধ্যের নিচ, নিচের ওপর, নিচ। নিচে এ জাতীয় নানা ভাগকে ছকে চিত্রিত করে দেখান হচ্ছে। হরফগুলোর ব্যবহার করা হয়েছে ধ্বনিতত্ত্বের। কোনো বিশেষ ভাষার নয়। একেবারে ওপরে, ডান থেকে বামে জিবের কোন অংশ সক্রিয় তার নির্দেশ। তার নিচে, ডান থেকে বামে প্রতি অংশের ধ্বনির প্রসৃত ও বর্তুল উভয় রূপ বিচার। বামে ওপর থেকে নিচে উচ্চতার সাতটি স্তর ক্রমান্বয়ে নিম্নমুখী।

	সম্মুখ		মধ্য		পশ্চাৎ	
	প্রসৃত	বর্তুল	প্রসৃত	বর্তুল	প্রসৃত	বর্তুল
উপর						
উপর-নিচ						
মধ্যের উপর						
মধ্য						
মধ্যের নিচ						
নিচের উপর						
নিচ						

এই ছকের বাইরে আরো যে কয়েক জাতের স্বরধ্বনি পৃথিবীর অনেক ভাষাতেই ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর উল্লেখ করা দরকার। এগুলো রীতির দিক থেকে বর্ণিত স্বরধ্বনিসমূহ থেকে স্বতন্ত্র। এই অর্থে অঙ্কিত ছকের প্রতিটি স্বরধ্বনির ওপর এই রীতির আরোপ কল্পনা করা যায়। যেমন এতক্ষণ যে স্বরধ্বনির বর্ণনা করেছি তাব সবই মুক্তি পায় মুখ দিয়ে। কিন্তু জিবের সকল অংশের সকল উচ্চতার বর্তুল এবং প্রসৃত সকল স্বরধ্বনিই নাসাপথেও মুক্তিলাভ করতে পারে। সাধারণ স্বরধ্বনি উচ্চারণে অপর পিঠ নাসাপথের মুখ বন্ধ রেখে ধ্বনিবাহী সকল বায়ুপ্রবাহ কেবলমাত্র মুখের পথে ঠেলে দেয়। কিন্তু যদি নরম তালুর অপর পিঠ ঝুলে পড়ে নাসাপথ খুলে রাখে তাহলে হাওয়া একই সঙ্গে মুখ ও নাক উভয় পথে বেরুতে থাকবে। ধ্বনি আনুনাসিক হবে। নাসিক্য স্বরধ্বনি বাঙালির মুখে হরদম শোনা যায়। যেমন পাঁচ, পোঁচ, ছুঁচকে ইত্যাদি শব্দের প্রথম স্বরধ্বনি।

বিভিন্ন স্বরধ্বনি উচ্চারণে সাধারণ অবস্থায় জিবের সম্মুখ, মধ্য বা পশ্চাৎ যে অংশই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করুক না কেন, জিবের ডগা কিন্তু সব সময়েই একরকম নিষ্ক্রিয় এবং পরিবর্তনহীন। জিবের ডগা নিচের দিকে ঝুলে পড়ে নিচের দাঁত বা দাঁতের গোড়া আলতোভাবে স্পর্শ করে এলিয়ে থাকে। কিন্তু স্বরধ্বনি উচ্চারণ করবার সময়েও মূর্ধন্য ব্যঞ্জনের মতো সকলকে জিবের ডগাকে ওপরের দিকে ঠেলে তুলে বেঁকিয়ে মধ্য তালুমুখী করে রাখা যায়। যে সমস্ত স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিবের স্থান ও উচ্চতা এবং ঠোঁটের বিশিষ্ট অবস্থান বর্ণিত ছকের অনুরূপ হয়েও, একই সঙ্গে জিবের ডগার এই মূর্ধামুখী বক্রতাকেও প্রশ্রয় দেয় সেগুলোকে মূর্ধন্যস্বর বলা যেতে পারে। ইংরেজি হরফ অনেক মার্কিন দেশীয় ব্যক্তি যেভাবে উচ্চারণ করেন তাতে মধ্য-জিবের মধ্য-উচ্চতার প্রসৃত স্বরধ্বনির সঙ্গে জিহ্বাগ্রের মূর্ধামুখী বক্রতা প্রায় সব সময়ে বিদ্যমান থাকে। ধ্বনিতত্ত্বে এটাকে প্রকাশ করা হয় ∂ ~ হরফ দ্বারা। এমনি করে অন্যান্য সকল সাধারণ স্বরধ্বনির একটি করে মূর্ধন্যরূপও ধ্বনিতত্ত্বের বিশ্লেষণে যুক্তিসংগতভাবে বিচার করা যেতে পারে।

স্বরধ্বনি সব সময়ে স্বরযুক্ত এটা সাধারণভাবে যখন-তখন বলি বটে, কিন্তু এর ব্যতিক্রম অসম্ভব নয়। পৃথিবীতে এমন ভাষার সন্ধান পাওয়া যায় যেখানে ঘোষ স্বরধ্বনি এবং অঘোষ স্বরধ্বনি উভয়ের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য করা হয়। আমরাও বিশেষ অবস্থায় ফিসফিস

করে বা অতি ক্ষীণ কণ্ঠে যখন কথা বলি তখন স্বর প্রায় ধ্বনিতই হয় না। অবশ্য ইংরেজি বা বাংলায় সাধারণ কথায় অঘোষ স্বরধ্বনি শোনা যায় না, শোনা গেলেও তার কোনো বিশিষ্ট তাৎপর্য নেই।

হ জাতীয় ধ্বনিকে কেউ কেউ সকল অঘোষ স্বরধ্বনির সাধারণ প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি হয়েছেন। এর কারণ হলো এই যে ব্যঞ্জনধ্বনি বর্ণানুযায়ী হ জাতীয় ধ্বনি হলো কণ্ঠ্য শিসজাত এবং স্বরযন্ত্রের উৎপাদিত এই ধ্বনি মুখের অন্য কোথাও বাধা পায় না, পীড়িত হয় না বা কম্পন সৃষ্টি করে না। হ'র নানা সূক্ষ্ম রূপভেদ নির্ভর করে পরবর্তী স্বরধ্বনির ওপর। প্রতিটি বিশেষ হ উচ্চারণের সময় কেবলমাত্র গলার মধ্যে স্বরতন্ত্রী দুটো শক্ত হয়, সংকীর্ণায়িত পথে বাতাসকে পীড়িত করে এবং মুখের অনুগামী গহ্বর পরবর্তী স্বরধ্বনির বিশিষ্ট আয়তনাকার গ্রহণ করে। এইভাবে বিচার করলে প্রতিটি হ পরবর্তী ঘোষ স্বরধ্বনি অবিকল অঘোষ পূর্বাভাষ মাত্র।

ব্যঞ্জনধ্বনির প্রাণ-মহাপ্রাণ ধ্বনির অনুরূপ স্বরধ্বনিকেও একরকম কোমল ও কঠিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। কোমল স্বরধ্বনি উচ্চারণে মুখের নানা পেশী অপেক্ষাকৃত শিথিল এবং বায়ুপ্রবাহ মৃদুতর। কঠিন স্বরধ্বনিতে বিপরীত অবস্থা। ধ্বনিতত্ত্বে উপর, মধ্যের উপর এবং মধ্যের নিচে এই তিন স্থানের স্বরধ্বনিকে তুলনামূলকভাবে কঠিন এবং বাকিগুলোকে তুলনায় কোমল বলে অভিহিত করা হয়। ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রে মহাপ্রাণতা কাঠিন্যের লক্ষণ, স্বল্পপ্রাণতা কোমলতার।

বাকধ্বনির শ্রেণীকরণে উদ্যোগী হয়ে আমরা প্রথম থেকে ধরে নিয়েছি যে মুখের বহতাবাণীকে বিশ্লেষণের স্বার্থে খণ্ড খণ্ড ধ্বনিতে বিভক্ত করা অসঙ্গত নয়। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা এ যাবৎ স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির বিস্তৃত বর্ণনা করেছি এবং মনে মনে এমন ধারণাও পোষণ করেছি যে, শুধুমাত্র স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি নানা রকমে পরপর গেঁথে মুখের বুলি তৈরি হয়। এরকম ধারণায় গলদ কোথায়, এবার সেটাই বিবেচনা করে দেখা যাক। দুনিয়ার এমন অনেক ভাষা আছে যার অনেক কথা বা কথার অংশ স্বরব্যঞ্জন ধ্বনির সমাবেশের দিক থেকে অবিকল এক হয়েও ভিন্নার্থ প্রকাশ করে। এর কারণ হলো এই যে অংগসংস্থানের ভিত্তিতে পুঙ্খাপুঙ্খরূপে বর্ণিত স্বরব্যঞ্জন ধ্বনিকে আমরা যখন কোনো ভাষায় মুখের বুলিতে রূপ দেই তখন তার ওপর আরো নতুন গুণাগুণ আরোপ করি। সেহেতু এই গুণাগুণ বিশেষ ধ্বনির একক বৈশিষ্ট্য নয়, এবং এর প্রভাব অনেক ক্ষেত্রে একাধিক ধ্বনিপুঞ্জের ওপর সম্মিলিতভাবে বিস্তৃত থাকতে পারে। এই কারণে ধ্বনির মৌলিক শ্রেণীকরণে রূপভেদের এই তত্ত্বটা উহ্য রাখা হয়েছিল। কিন্তু একে একেবারে অবহেলা করা যায় না। রীতি ও উচ্চারণের দিক থেকে হুবহু এক হয়েও কোনো কোনো ধ্বনি কেবলমাত্র হ্রস্ব-দীর্ঘতার ভিত্তিতে ভিন্ন তাৎপর্য বহন করতে পারে। একই ব্যঞ্জনধ্বনি শোয়াসের ঝোঁক দিয়ে জোরে উচ্চারিত হচ্ছে আবার অন্য কোথাও বিনা ঝোঁকেও সহজ তালে বলা হয়। একই স্বরধ্বনি কখনও নিচুসুরে বাঁধা থাকে, কখনও স্বরতন্ত্রীর দ্রুততর কম্পনে তীক্ষ্ণতর উঁচুসুরে ধ্বনিত হয়। প্রায় সব ভাষাতেই একরকম হয়। তবে কোনো ভাষায় বৈষম্য নিতান্ত ধ্বনিগত এবং তুচ্ছ, কোনো ভাষায় এরকম তারতম্য ভাষাভাষীদের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ, অর্থবাহী। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে এই তিনটি রূপবৈশিষ্ট্য—কালগত মাত্রা, শ্বাসাঘাত ও স্বরাঘাত—সবই সংশ্লিষ্ট ধ্বনির সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিচার্য। কোনো স্থির নির্ধারিত পরম মান এখানে অচল। স্বর ও ব্যাঞ্জন ইত্যাদি ধ্বনির কল্পিত খণ্ডসত্তার সঙ্গে এরা অব্যবহিতভাবে সমকালে

বিদ্যমান থাকতে পারে বলে এবং কখন-কখনও গ্রন্থিবদ্ধ একাধিক ধ্বনির এলাকাকে প্রভাবান্বিত করে বলে এগুলোকে আমরা আরোপিত এবং বিস্তৃত ধ্বনিবৈশিষ্ট্য বলে অভিহিত করতে পারি। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বরব্যঞ্জন ধ্বনিসমূহকে খণ্ডিত মূল ধ্বনি বলা অসঙ্গত হবে না। কারণ কালগত মাত্রা, শ্বাসঘাত এবং স্বরাঘাত মূল ধ্বনিকে আশ্রয় করে সূচিত হয়, স্বতন্ত্র কোনো স্বাধীন সত্তা নেই। এগুলো ধ্বনি নয়, ধ্বনি ও ধ্বনিমালার বৈশিষ্ট্য মাত্র।

আরেকটা উল্লেখযোগ্য ধ্বনিবৈশিষ্ট্য আছে বাকধ্বনির রূপবিচারে যারও নাম না করলেই নয়। ধ্বনিতে ধ্বনি গেঁথে মানুষ কথা বলে বা ধ্বনির মালা গড়ে। কিন্তু সকল ভাষায় ধ্বনি গাঁথার রীতি এক নয়। এক ধ্বনির সঙ্গে অন্য ধ্বনির বাঁধন সব সময় একরকম হয় না। দুটো বাক্যের বা বাক্যাংশের মধ্যে লক্ষণীয় বিরাম পড়ে, দুটো শব্দে তার চেয়ে সংক্ষিপ্ত ধ্বনি বিরতি, একই শব্দে প্রায় নিরবচ্ছিন্নতা। সন্ধি করা জোড় শব্দে অনেক ধ্বনির গাঁথুনিতে শ্রুতিগ্রাহ্য ফাঁক পড়ে কি ? অনেক ভাষায় ধ্বনির গ্রন্থনরীতি স্পষ্ট, পরস্পরের জোড় একেবারে মিলে যায় না। অন্তত যে-কোনো দীর্ঘ বুলিতে কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর নানা আকৃতির ধ্বনিগুচ্ছের পর অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট গ্রন্থিচ্ছেদ লক্ষ করা যায়। কোনো ভাষায়, বিশ্লেষণের জন্য, দীর্ঘ বুলিকে খণ্ডিত করা দুরূহ হয়ে পড়ে, কারণ তার ছোট বড় ধ্বনিপুঞ্জের মধ্যে কোনো বিভাজ্য ফাটল পাওয়া যায় না, সবটাই কী রকম যেন এক নিরবচ্ছিন্ন ধ্বনিমালার মতো মনে হয়। আবার এমন অনেক ভাষা আছে যেখানে দুটো ধ্বনির মধ্যে বিরতি ছেদ কত সংক্ষিপ্ত বা প্রলম্বিত তার ওপব ভাবার্থ নির্ভর করে। সার্থক ব্যাকরণেব পক্ষে তখন চোখে আঙুল দিয়ে একথাটা দেখিয়ে দেয়া দরকার যে, একই ধ্বনিপুঞ্জ আরোপিত গুণে মণ্ডিত এবং একই ক্রমে গ্রথিত হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র ধ্বনি পরস্পরেব গ্রন্থনরীতি পৃথক হওয়ার জন্য গোটা বুলির তাৎপর্য পাল্টে যাচ্ছে। এই গ্রন্থনরীতি কত রকমের হতে পারে তার ধারণা বিশেষ ভাষার উদাহরণ ছাড়া স্পষ্ট করে তোলা দুরূহ। যেহেতু এর নিজস্ব ধ্বনিগত প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো নানা পরিমাণের নীরবতা, এর বর্ণনা দৃষ্টান্ত সহকারে পেশ করাই লাভজনক। বর্ণতত্ত্বের পরিচ্ছেদের সে আলোচনা সংযোজিত হবে। নিপুণ মালাকার যেমন সব ফুলের মালা একই রকম করে গাঁথে না, এই মালায় নানা রকম গেরোয় কারসাজিতে ছোটবড় বিচিত্র গুচ্ছে ফুলকে বাঁধে আমরাও তেমনি যখন বাক্‌ধ্বনির পুঁজি সম্বল করে কথামালা রচি তখন পরপর তাদের সাজিয়ে যাই বটে কিন্তু কখনো ফাঁক রেখে, কখনো ঘন করে, কখনো গুচ্ছে গুচ্ছে বেঁধে। এখন থেকে ভাষাব এই কৌশলকে আমরা ধ্বনি গ্রন্থি বলে উল্লেখ করব।

রকমারি রূপ : একই ভাষার রকম ফের

দুটো মুখের বুলির মধ্যে কতদূর পার্থক্য থাকলে দুটোকে একই ভাষার অন্তর্গত বলে বিবেচনা করব আর কখন দুভাষায় ভাগ করে দেব তার নীতি নির্ধারণ করা কঠিন, শুনতে একরকম মনে হলেই দুটো একই ভাষাভুক্ত হবে তার কোনো মানে নেই। কিছুই জানা নেই এমন দুটো ভাষার মধ্যে কেবলমাত্র শুনেই পার্থক্য করা, বিশেষ করে যদি সে দুটো এক গোত্রের ভাষা হয়, অনেক সময়েই সম্ভব নয়। চার-পাঁচ রকমের রেড ইন্ডিয়ান ভাষা পরপর আউড়ে গেলেও ধরতে পারব না কখন একটার শেষ, আরেকটার শুরু। ধরতে পারব না সেগুলোর মধ্যে ভাষাগতভাবে কোনটার সঙ্গে কোনটার কী আত্মীয়তা। একেবারে বিপরীত, শোনালেই যে

দুটো ভাষা বলে ধরে নিতে হবে তারও কোনো মানে নেই, একই ভাষা অঞ্চলবিশেষে এমনভাবে কথিত হয় যে অন্য অঞ্চলের লোকের কাছে তা অকথ্য এবং অশ্রাব্য। এমন কি দুজন বক্তা যদি পরস্পরের কথা বুঝতে না পারেন তবুও নিশ্চয় করে বলা চলে না যে দুজন দুভাষায় কথা কন। বোধগম্যতার মাত্রা পরিমাপ করাও দুরূহ। কোলকাতার বাবু নোয়াখালীর চাষীর কথা বুঝবেন বলে ভরসা কম। চাঁটগায়ের লোক বাড়ির পাশের চাকমাদের কথা বোঝে না। ভাষাতাত্ত্বিক বহু যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে দিতে পারেন যে, এগুলো সবই বাংলা ভাষার রকমফের মাত্র। যদি নিতান্তই একটা সংজ্ঞা দাঁড় করাতে হয় তবে এমন বলা চলে যে যদি কয়েকটি অঞ্চলের ভাষাভাষীরা পরস্পরের কথা সরাসরি বুঝতে পারে বা তাদের মধ্যবর্তী যে-কোনো অঞ্চল বা নিকটতম অঞ্চলসমূহের ভাষা বোঝে এবং পরস্পরের সঙ্গে বোধগম্যতার এই ক্রমানুসারে পরপর শৃংখলিত থাকে অথবা প্রতি অঞ্চলের নিজ ভাষারূপ ছাড়াও যদি সর্ব অঞ্চলের মান্য কোনো সাধারণ ভাষারূপ প্রচলিত থাকে এবং এই সকল অঞ্চলের ভাষারূপের মধ্যে যদি বর্ণ ও ব্যাকরণগত মিল দৃষ্ট হয় তবেই বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা একই ভাষার অন্তর্গত নানা রূপ বলে পরিগণিত হবে। আমরা এই দীর্ঘ সংজ্ঞায় ভাষার আঞ্চলিক রূপের কথা বলেছি বটে তবে এই সংজ্ঞার মূল ভাব, যে কোনো অন্য রীতির বা প্রকারের ভাষারূপ সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য। আমরা এই পরিচ্ছেদে ভাষার নানা প্রকার রকমফের এবং তার অনুশীলন-রীতি সম্পর্কে আলোচনা করব।

একই ভাষা কালে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে আমরা জানি। তিনশ বছর আগে বাংলার যে রূপ ছিল আজ তা নেই। চর্যাপদের বাংলা শহীদুল্লাহ সাহেব বুঝিয়ে না দিলে হাল আমলের বাংলা পাঠকের সাধ্য নেই যে অর্থোদ্ধার করে। ভাষার এই কালগত বিবর্তন ঐতিহাসিক বা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বিচার্য বিষয়। এই বিজ্ঞান বিবর্তনের ধারাকে বর্ণনা করে নানা শাখায় তার বিস্তারকে স্পষ্ট করে তোলে। নতুন ভাষার জন্মকালের ইঙ্গিত দেয়। এর সবটাই বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের আওতার বাইরে। বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব কেবলমাত্র সাম্প্রতিককালে চলন্ত ভাষার রূপ ব্যাখ্যায় উদ্যোগী। ভাষার যে রকমফেরকে প্রত্যক্ষ করতে চায় তা কালে বিস্তৃত নয়, তার বিস্তার বিশেষ স্থানে, বিশেষ কালে, বিশেষ সমাজে।

একই কালে একই ভাষা নানা অঞ্চলে নানা রূপ নিতে পারে, বিশেষ অঞ্চলের নামের সঙ্গে ভাষার সাধারণ নামটি জুড়ে দিয়ে এর আঞ্চলিক পরিচয় দিয়ে থাকি। যেমন নোয়াখালীর বাংলা, চট্টগ্রামের বাংলা ইত্যাদি, অনেক ভাষার ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে যে সমাজে সকল শ্রেণীর লোকের বুলি এক প্রকারের নয়, সামাজিক শ্রেণীভেদে ভাষার রূপভেদ দ্রাবিড় ভাষায় মেলে। দক্ষিণ ভারতের কোনো কোনো স্থানে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের বুলিতে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যেমন ধারওয়ার কানাডায়। বাংলাতে যে এরকম একেবারে হয় না তা নয়। ঢাকার যে বুলিকে ঢাকাইয়া বলা হয় তার কথকদের বিশেষ সামাজিক শ্রেণীতে বিভক্ত করা সম্ভব। ঢাকার শাঁখারী এবং শকট-চালকেরা নিজেদের মধ্যে যে বিশেষ ভাষা ব্যবহার করে তার রূপ ঢাকার অন্যান্য পেশার অশিক্ষিত জনসাধারণের থেকেও স্বতন্ত্র। এ হলো ভাষার সামাজিক শ্রেণীভেদ।

এ দুজাতের ভিন্নতা ছাড়া ভাষার আরেকটি তৃতীয় পর্যায়ের স্তরভেদ লক্ষ করা যায়। যেমন অনেক ভাষাভাষীদের মধ্যে এমন রেওয়াজ প্রচলিত আছে যে একই ব্যক্তি দুরকম অবস্থায় একই ভাষাকে দুরকমে ব্যবহার করে। যেমন আরবিভাষীরা। রীতিগতভাবে আরবিভাষার

দুটো রূপ আছে। একটা হলো সাধু আরেকটা চলতি। অনেকটা বাংলার মতো, যদিও ব্যবহারিক তাৎপর্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। সাধু আরবিতে কেতাবাদি লেখা হয়। এই ভাষাই যে-কোনো ভদ্র পরিবেশে কহতব্য। বক্তৃতামঞ্চে, রেডিওতে, মজলিশে এই ভাষাই শোনা যায়। চলতি ভাষার এলাকা হলো ঘরে, যা নিতান্ত ঘরোয়া পরিস্থিতিতে। কোনো ভাষার এই পর্যায়ের বৈচিত্র্যকে আমরা আচরণিক বলে অভিহিত করতে পারি। পূর্ববঙ্গে বাংলা কয়েকটি বিশিষ্ট আচরণিক রূপ অনেক দিন থেকেই প্রচলিত ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর সেগুলো আরো স্পষ্টতা লাভ করেছে এবং নতুন স্তরের ভিত্ গড়ে দিয়েছে। যেমন বঙ্গবাসী বরাবরই ঘরে বা ঘরোয়া পরিস্থিতিতে নিজের পৈতৃক আঞ্চলিক বাংলা ব্যবহার করত। বাইরে একটু পোশাকী অবস্থায় পড়লেই আপ্রাণ চেষ্টা করতো নদে-শান্তিপুরের বাংলাকে অনুকরণ করতে। কারণ শেষের ভাষাটাই ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণে গোটা বঙ্গের আদর্শ চলতি বাংলার মর্যাদা লাভ করে এবং সকল শিক্ষিত বাঙালির কাছে বরণীয় হয়ে ওঠে। দেশভাগের পর পূর্বপাকিস্তানিদের মুখে বাংলা বুলি আরেকটা নতুন মোড় নিতে শুরু করেছেন বলে মনে সন্দেহ জাগে। বঙ্গজ বুলিকে বহুকাল থেকে বাঙালি সমাজে এবং বঙ্গসাহিত্যে অবজ্ঞা-উপহাসের গ্লানি বয়ে বেড়াতে হয়েছে। পূর্ববঙ্গের লোক অনেক চেষ্টা করেও যখন অবস্থা বিশেষে কলকাতাই বুলি ভালমতো নকল করতে পারে নি তখন বিব্রত অনুভব করেছে, অপদস্থ হয়েছে। এরকম অবস্থার স্বাভাবিক ফল হিসাবে মনে হয় যে অভিযোগ এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আজ সেটাই যেন এখানে সেখানে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। ভারতীয় প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গের বুলি নির্ভুলভাবে অনুকরণ করতে না পারলেই হেয় হয়ে যাব, আজকের পূর্ববঙ্গবাসী যেন চোখ বুঁজে একথা মানতে আর রাজি নয়। আগের মতো আজও সে ঘরে আঞ্চলিক বুলি ব্যবহার করে, কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়েই সেটাকে ঝেড়ে ফেলে না। যাকে অন্যান্য অঞ্চলের শ্রোতার কানে অসহনীয় না হয় সে রকম করে একটু মেজে-ঘষে নিয়ে এই ঘরের বুলিকেই ঘরের বাইরে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছেন। পূর্ববঙ্গের অনেক শিক্ষিত বাঙালি আজ এই রকম একটা অনির্দিষ্ট অস্থির মানের পরিমার্জিত আঞ্চলিক বুলিতে যে-কোনো বুদ্ধিবৃত্তিমূলক কঠিন তত্ত্বালোচনা অবাধে চালিয়ে যান। কলকাতার বুলিকে একেবারে বর্জন করেছেন তা নয়। বক্তৃতামঞ্চে, রেডিওতে, সাহিত্যের আসরে এখনও সে বুলির একচ্ছত্র আধিপত্য। তবে এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, এই তিন ভঙ্গীর বাংলার মধ্যে কালক্রমে মধ্যের বুলিটি নতুন নতুন শক্তি সঞ্চয় করে, নতুন মর্যাদায় মণ্ডিত হয়ে সর্বজন অনুকরণীয় পূর্বপাকিস্তানের সাধারণ চলতি বাংলায় পরিণতি লাভ করতে পারে। নানা আঞ্চলিক ভাষায় লেনদেনের মধ্য দিয়ে কোনো দেশে একটি নতুন সাধারণ কথ্যবুলি কী করে জন্ম নেয় তার বিরাট পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে পূর্বপাকিস্তানে। উৎসাহী ভাষাতত্ত্ববিদদের কর্তব্য এই অবস্থার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও পরিপূর্ণ বর্ণনা সকলের সামনে পেশ করা।

আঞ্চলিক, সামাজিক এবং আচরণিক ভাষার এই তিনটি বহু প্রচলিত প্রকরণের মধ্যে প্রথমটি ভাষাত্ত্ববিদদের মনোযোগ লাভ করেছে সবচেয়ে বেশি। আধুনিক বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের জন্মলাভের অনেক আগে আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক ভাষাতত্ত্বের কাজ শুরু হয়। ভাষাতত্ত্ববিদদের প্রথম টনক নড়ে যখন কালের ধারায় কোনো ভাষার বির্তনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হঠাৎ লক্ষ করলেন যে কিছু দৃষ্টান্ত সব সময়েই এদিক-সেদিক ছড়িয়ে থাকে, যেগুলোকে কোনো সূত্রের বাঁধনেই স্থিরভাবে গেঁথে দেয়া যাচ্ছে না। একটি অবিভক্ত উৎস

থেকে পরবর্তী শাখা এবং প্রতি অবিভক্ত শাখা থেকে পরবর্তী প্রশাখা বিস্তার লাভ করেছে, এমন মীমাংসা পরিপূর্ণরূপে সন্তোষজনক হচ্ছিল না। কেবলি মনে হচ্ছিল প্রতি স্তরেরই উৎস বা মূল একাধিক বা একই স্তরের একই ভাষার রূপ বিচিত্র এবং একই ভাষার নানারূপ সামগ্রিকভাবে বিবর্তনের ধারায় বা যে কোনো সাধারণ নীতি-নিয়মের বন্ধনকে স্বীকার করতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে উনবিংশ শতাব্দীর জার্মান ও ফরাসি ভাষাবিদরা ভাষার মানচিত্র অঙ্কনে উদ্যোগী হলেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল একই ভাষার নানা এলাকার রূপগত সীমাকে স্পষ্ট করে চিহ্নিত করা। প্রসঙ্গত একই ভাষার নানা বৈশিষ্ট্য কি বিচিত্র সম্পর্কে নানা এলাকায় বিস্তারিত, কি সম্ভাব্য কারণে তারা পরস্পরের উপর প্রভাবশালী, নানা ভাষাগত প্রভাবের জয় পরাজায়ের টানাপোড়েন ইত্যাদি সকল ইতিবৃত্তকে উদ্ঘাটিত করা তাদের লক্ষ্য। আমরা আরো বিস্তৃতভাবে জার্মান ও ফরাসি ভাষার দুটো বিখ্যাত মানচিত্রের আলোচনা করব এবং তাদের অনুসন্ধান রীতির মূল তত্ত্ব বুঝতে চেষ্টা করব। পূর্ববঙ্গে আঞ্চলিক ভাষার রূপভেদ লক্ষ করা যায় তারও একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অবশ্য তার আগে ভৌগোলিক ভাষাতত্ত্ববিদরা ভাষার আঞ্চলিক বিবর্তন বর্ণনা করতে গিয়ে যে পরিভাষা ব্যবহার করেন তার দু'একটা সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করে নেয়া ভালো। প্রথম কথা হলো এই যে, ভাষার রূপভেদকে বর্ণনা করতে হলে এলোমেলো বিচার না করে ধাপে ধাপে এগুতে হবে। বিরাট এলাকার জবানী সংগ্রহ করে তাদের ধ্বনি, বর্ণ, শব্দ, অর্থ, বাক্য সব তুলনা করে তবে স্থির করতে হবে পরস্পরের মধ্যে কোন প্রকারের তারতম্য কত গভীর বা অগভীর।

ধ্বনিগত পার্থক্য এবং বর্ণগত পার্থক্য এক নয়, যেমন ধরা যাক দুটো কথা : /কাল/এবং/খাল/। 'ক' এবং 'খ' এ ভাষার দুটো স্বতন্ত্র বর্ণ। কারণ ধ্বনির এই সামান্য পাথ্যক্যের জন্য অর্থভেদ ঘটছে। ক অল্পপ্রাণ, খ মহাপ্রাণ। এই ভাষার কোনো বিশেষ অঞ্চলে কোনো অনির্ণীত কারণে হয়ত কেউ খ কে একটু অতিরিক্ত খসখসে গলায় বলতে শুরু করল। দেখাদেখি আরো অনেকে এই ঘর্ষণজানিত ধ্বনি খ-কে উচ্চারণ করতে লাগ। ক্রমে এমন দাঁড়াল যে এই অঞ্চলে প্রায় সবাই খালকে [X al] বলে। এরকম অবস্থায় আমরা এমন বলতে পারি না যে, এ অঞ্চলে খ বর্ণ নেই, আছে X কারণ, বৈপরীত্যের বর্ণ ধর্ম অনুসারে আদর্শ বুলির ক ঃ খ এবং অঞ্চল বিশেষের K ঃ X সম্পূর্ণরূপে তুল্যমূল্য। যতক্ষণ অবধি দ্বিতীয় বুলিতে খ'র সঙ্গে K ঃ X-র কোনো তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য সূচিত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত উভয় বুলির মূল বর্ণসম্পদ অভিন্ন বলে মেনে নিতে হবে। দুই অঞ্চলের ভাষার মধ্যে যে ধ্বনিগত বৈষম্যের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো তার ভিত্তি হলো সংখ্যানুপাত। অনেক লোকের মুখে দ্বিতীয় অঞ্চলে/খ/বর্ণের শব্দাদি [x] ধ্বনিতে উচ্চারিত হয়, এইমাত্র। আরো একটা কথা। এই [x] উচ্চারণ বর্ণগত নয়, অবস্থানগত। যেমন, হতে পারে যে শব্দের আদিতে, স্বরবর্ণের আগে এই অঞ্চলে [x] উচ্চারিত হয়, অন্যত্র [kh], এরকম অবস্থায় প্রথম বুলির বর্ণ /ক/এবং/খ/, দ্বিতীয় অঞ্চলের বর্ণ /ক/এবং/x/। একরকম বলার কোনো কারণ নেই। আঞ্চলিক ভাষা বর্ণনার ক্ষেত্রে এরকম সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে নানা অঞ্চলের বুলির বর্ণমালা এক হয়েও তাদের ধ্বনিরূপ বহু এবং বিচিত্র হতে পারে।

ধ্বনিগত পার্থক্য কখন বর্ণগত পার্থক্য বলে পরিগণিত হতে পারে তার একটা কাল্পনিক দৃষ্টান্ত নেয়া যাক। ধরা যাক, কোনো বিশেষ অঞ্চলে /ক/,/খ/ দুটো বর্ণ আছে। /খ/এর দুটো ধ্বনিরূপ আছে। একটা হলো [kh] অন্যটা [x] শব্দের আদিতে, স্বরধ্বনির পূর্বে [x]

যেমন xy অন্যত্র [kh]. [kh] পাই দুই স্বরধ্বনির মধ্যে যেমন VkhV. এখন যদি কোনো কারণে কোনো বিশেষ শব্দের আদ্যস্বর লুপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু [kh] উচ্চারণ অটুট থাকে তাহলেই বর্ণ বৈপরীত্য সৃষ্টি হলো। তখন বলতে হবে এ অঞ্চলে x একটি স্বতন্ত্র বর্ণ, খ'র ধ্বনিরূপ মাত্র নয়। এই অঞ্চলে /ক/,/খ/এবং /x/। তিনটেই বর্ণরূপে বিবেচ্য।

এমনি করে দুটো অঞ্চলের ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলী মোটামুটি এক হলেও পদগঠনের রীতি একেবারে বিপরীত। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের বাংলার মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য এই পদগঠনের রীতি নিয়ে। অঞ্চলভেদে বাক্যরীতির ভেদ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

মাত্র দুটো খণ্ডিত উক্তি সামনে রেখে তাদের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য কী তা বর্ণনা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু দৃষ্টান্ত যদি বহু এবং বিস্তৃত হয় এবং পরস্পরের মধ্যে যে পার্থক্যগত বৈশিষ্ট্য তাকে যদি জটিলতার ক্রমানুসারে সাজাতে হয় তবে সে কাজ দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। তার ওপর যদি সেই বৈশিষ্ট্যের ক্রমসম্বল করে জমি জরিপে নামতে হয়, কোন বৈশিষ্ট্য কোন ভূমির কোন প্রান্ত থেকে কোন প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত তার মীমাংসা করতে হয়, তাহলে সে দায়িত্ব পালন প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয়। কারণ ভাষা মানুষের মুখের সম্পদ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হলেও ঠিক নদী-সাগর-গাছপালার মতো অপেক্ষাকৃত স্থির স্থায়ী, স্পষ্ট বস্তু সীমানায় আবদ্ধ নয়। এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলের ভাষা-সীমানা ঠিক কোনখানে, দু'অঞ্চলের মধ্যে একশবার ছুটোছুটি করেও, সাধারণ পথিকের সাধ্য নয় তাকে খুঁজে বার করে। একটু একটু করে বদলাতে হয় এক জায়গা এসে সবটা মিলে এমন রূপ নেয় যে, তখন শোনামাত্র সন্দেহ থাকে না যে এটা ভিন্ন অঞ্চলের বুলি। এইজন্যে অনেকে বলেছেন যে ভাষার ভৌগোলিক সীমানা বলে ধরাবাঁধা কোনো স্পষ্ট সীমারেখা থাকতে পারে না। সবই ক্রমিক, কিছুই আকস্মিক নয়। সবই ঢালামেলা, কিছুই চুলচেরা নয়।

ভাষাবিদরা এটা অস্বীকার করেন না। অবশ্য তাঁরা বলেন যে, আমরা যখন আঞ্চলিক ভাষাব আঞ্চলিক মানচিত্র আঁকতে বসি তখন আমরাও এমন কিছু সূক্ষ্ম রেখায় সীমানা চিহ্নিত কবব বলে মনস্থ করি না। আমরা মানি যে কোনো অঞ্চলের ভাষারূপে যখন আস্মিকভাবে একটা নয়া বাকভঙ্গী সংযুক্ত হয় তখন প্রথম সেটা মাত্র অল্প কয়েকজনের মুখে আন্দোলিত হয। যদি সে নবীনতার প্রাণশক্তি প্রবল হয় তবে ক্রমে সেটা অধিক সংখ্যক লোকের মুখে ভর করে চক্রাকারে তরঙ্গায়িত হয়ে ক্রমশ বৃহত্তর এলাকায় বিস্তার লাভ করে। উৎসগত কেন্দ্রবিন্দু থেকে যত দূরে যায়, তত তার প্রভাব ক্ষীণ হতে থাকে এবং শেষটায় প্রবলতর কোনো বিপরীতমুখী ভাষারূপগত প্রভাবের তরঙ্গাঘাতে বা অন্য কোনো মানবিক বা প্রাকৃতিক বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে ক্রমশ বিলীন হয়ে যায়। আমাদের গোটা বিচারটাই পরিসংখ্যানমূলক। মোটামুটিভাবে একটা দৃষ্টান্ত যদি এক গ্রামের অনেক লোকের মুখে একরকম উচ্চারিত হয়, পাশের গ্রামের অনেক লোকের মুখে অন্যরকম; তাহলে আমরা এই দু'গ্রামের মধ্য দিয়ে একটা ভাষা-রেখ বা আইসোগ্লাস কল্পনা করতে পারি। কত অধিক বিচিত্র এবং তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত কত বেশি লোকের জবানিতে পরখ করছি এবং সেই সব লোকেরা কত কাছাকাছি অবস্থিত, তার ওপর নির্ভর করে পরিসংখ্যানমূলক বিচার। বাস্তব অবস্থাকে কতটা সততার সঙ্গে প্রতিফলিত করছে। যেখানে পাহাড় মাথা তুলেছে, নদী বয়ে গেছে. জিলা-থানা-গ্রামের সীমানা পড়েছে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ শ্রেণীতে মানুষ ভাগ হয়েছে, কোনো কারণে বসতি বিরল হয়ে এসেছে এমন স্থানেই ভাষা-রেখও স্পষ্টতা লাভ করতে চায়। ভাষাতত্ত্ববিদ যখন তার প্রশ্নাবলী তৈরি করেন, তখনই এগুলোরও সন্ধান নেন এবং

এরকম সম্ভাবনাপূর্ণ সন্ধিস্থলে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হন।

একটা ভাষা-রেখ একটি খণ্ডিত বুলির প্রতীক, যার দু'পাড়ে সেই একক বৈশিষ্ট্যের দুটো ভিন্ন রূপ দৃষ্ট হয়েছে। যেমন দাগ টেনে একপাশে লেখা হলো [kha ঃ I] অন্য পাশে [xa ঃ I] এরকম বৈপরীত্যের একাধিক নজির জরিপ করে যদি একটার পর একটা ভাষা ভাষা-রেখ টেনে যাওয়া যায় তবেই সেই ভূমির ভাষাগত মানচিত্র রচিত হয়। তখন দেখা যায় যে, ভাষার গতি অবিশ্বাস্য রকম আঁকাবাঁকা। একই ভাষা-রেখ একাধিক অঞ্চলকে ভেঙেচুরে পেঁচিয়ে ধরেছে, একাধিক ভাষা-রেখ এখানে সেখানে পরস্পরকে কেটে বেরিয়ে গেছে। সেখানে ভাষা-রেখ কোন গতিপথ অবলম্বন করবে আগে থেকে তা নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করার উপায় নেই। কেবলমাত্র কয়েকটি সাধারণ সম্ভাবনাকে সম্বল করে গবেষক নিজেকে বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সজাগ রাখতে পারেন এই পর্যন্ত। অনেকগুলো সংলগ্ন ভাষা-রেখ সমান্তরাল রেখায় সচরাচর দৃষ্ট হয় না। যদি কখনও তেমন পাওয়া যায় তখন একরকম জোর করে বলা যায় এইখানে একটা স্পষ্ট ভাষাসীমানা সূচিত হলো। সব ভাষা রেখের যে সমান মূল্য তা নয়। তার কিছু মুখ্য, কিছু গৌণ। কোনটা মুখ্য কোনটা গৌণ সে বিচার অনেকখানি নির্ভর করে সমগ্র অবস্থারও যে সম্ভাব্য চিত্র ভাষাতত্ত্ববিদ বিশেষ কর্মক্ষেত্রে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে রচনা করেছেন তার ওপর। মোটামুটিভাবে কেবলমাত্র এই বলা চলে যে একটি ক্ষীণ ভাষা-রেখের চেয়ে একাধিক ভাষা-রেখেব ঘন সন্নিবেশ বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। নিত্য ব্যবহৃত শব্দাবলীর প্রতীক ভাষা-রেখ, কচিৎ ব্যবহৃত পণ্ডিতি শব্দের ভাষা-রেখের চেয়ে দামী। যে ভাষা-রেখ কোনো ভোগোলিক-রাজনৈতিক-সামাজিক সীমানার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বৃহৎ কোনো এলাকাকে গণ্ডিবদ্ধ করে তার মর্যাদা আপাতদৃষ্টিতে বাহ্যকারণহীন কোনো ক্ষুদ্র অঞ্চল বেষ্টনকারী ভাষা-রেখের চেয়ে অনেক বেশি। কর্মক্ষেত্রে গভীরভাবে প্রবেশ করে অভিজ্ঞ ভাষাবিদ বিশেষ অবস্থা থেকে উদ্ভূত নানা উপলব্ধিকে আশ্রয় করে এ বিষয়ে পরিচ্ছন্নতর দৃষ্টি লাভ করেন।

আঞ্চলিক ভাষাব স্বরূপ নির্ণয়ে নানা ভাষাবিদ নানা দিক থেকে উদ্যোগী হয়েছেন। কেউ কেউ কেবলমাত্র শব্দাবলী সংকলিত করে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। এই বীতিই প্রাচীনতম, তারা সেই সংকলনে অনেক ক্ষেত্রে আবার শুধুমাত্র সেই সমস্ত শব্দ বা পদই সংগ্রহ করেছেন যেগুলো সর্বজনগৃহীত আদর্শরূপ থেকে স্বতন্ত্র। এছাড়াও এ জাতীয় সংকলনেব আরেকটা দুর্বলতা এর বানান পদ্ধতি। প্রায়ই বোঝার উপায় নেই যে সে বানান কতটা ধ্বনিগত, আর কতটা বর্ণগত, কতটা নিছক আদর্শ ভাষারূপের লিখন পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণ মাত্র। বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষারূপের কিছু ব্যাকরণও লেখা হয়েছে। তবে সেগুলোও বেশিরভাগ ইতিহাসমূলক। প্রধান লক্ষ্য ছিল বিবর্তনের কোনো ধারা অবলম্বলন করে সেই বিশেষ অঞ্চলের ভাষারূপের কিছু ব্যাকরণও লেখা হয়েছে। তবে সেগুলোও বেশির ভাগ ইতিহাসমূলক। প্রধান লক্ষ্য ছিল বিবর্তনেব কোন ধারা অবলম্বন করে সেই বিশেষ অঞ্চলের ভাষারূপের জন্ম তার রহস্যোদ্ধার করা। আধুনিক ভাষাতত্ত্বের শিক্ষাগুরু ব্লুম ফিল্ড এই বিচারের গলদ কোথায় তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। কোনো ক্ষুদ্র অঞ্চলের ভাষারূপে বিবর্তনের প্রভাব কিভাবে কার্যকরী হয়েছে তা বুঝতে হলে বৃহত্তর অঞ্চলে ক্ষুদ্রবৃহৎ চক্রাকারে প্রসারিত নানা প্রভাবকে খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করা দরকার, সে কাজ পরিপাটিরূপে নিষ্পন্ন করা স্বল্প আয়োজনে, অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব নয়। বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব সে রকম গবেষণায় উৎসাহিত নয়। বরঞ্চ সরাসরি কোনো আঞ্চলিক

ভাষার চলতি রূপকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করাই সর্বতোভাবে কাম্য। ভাষার নানারূপের মধ্যে কোনো রকম মর্যাদাভেদ বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের চোখে অর্থহীন। বিশেষ অঞ্চলের ভাষাকে বিশ্লেষণ করতে হবে, ঠিক যেমন করে বিশ্লেষণ করব রাজধানীর বা ভদ্রসমাজের সর্বজনী সাধু-চলতিকে অর্থাৎ আঞ্চলিক বুলির নিজস্ব বর্ণমালা, পদগঠন, বাক্যরীতি সব এক এক করে বর্ণনা করতে হবে। আঞ্চলিক ভাষার এ জাতীয় আলোচনা দুর্লভ।

আঞ্চলিক ভাষার যে তৃতীয় বিচার ভাষাতত্ত্বে স্থান পেয়েছে, তাকে বলা যেতে পারে ভাষা-জরিপ, ভাষার মানচিত্র রচনা। এই এলাকায় প্রথম উল্লেখযোগ্য হলো জার্মান ভাষার মানচিত্র। ১৮৭৬ সনে জর্জ ভেঙ্গুর এই কাজ শুরু করেন। সকল মানচিত্র সঙ্কলিত হয়ে প্রকাশ হতে হতে তিরিশ বছর পার হয়ে যায়। ভেঙ্গুরের পদ্ধতি দোষে-গুণে মণ্ডিত। তিনি চল্লিশটা বাক্য নিজের জার্মান বুলিতে রচনা করে সেগুলো দেশের সর্বত্র স্কুল-শিক্ষকদের কাছে কিছু নির্দেশনামা-সহ পাঠান। এ ব্যাপারে পুরো সরকারি সাহায্যও লাভ করেছিলেন। ঐ চল্লিশটা বাক্যই বিভিন্ন অঞ্চলের চল্লিশ হাজার মাস্টার সাহেবরা নিজেদের আঞ্চলিক বুলিতে তজমা করে ভেঙ্গুরের কাছে ফেরত পাঠান। মূলের সঙ্গে একটা একটা করে মিলিয়ে তর্জমাকারীর এলাকার সঙ্গে তার যোগসূত্র স্থাপন করে গড়ে ওঠে এই বিবাট আঞ্চলিক ভাষার মানচিত্র। প্রতিটি বৈষম্যের প্রতীক চিহ্ন হিসেবে সেই বিশেষ অঞ্চলকে বিভক্ত করে অঙ্কিত হয়েছে এক একটি ভাষা-রেখ। মানচিত্রের সঙ্গে এই ভাষা-রেখগুলো প্রথমবারে সন্নিবেশিতও হয়েছিল প্রশংসনীয় কৌশলের সঙ্গে। ভাষা-রেখগুলো আঁকা হয়েছিল স্বচ্ছ তেল-কাগজে। মানচিত্রগুলো দেয়া হয়েছিল স্বতন্ত্রভাবে। যে-কোনো বৈশিষ্ট্যের ভৌগোলিক বিস্তারকে প্রত্যক্ষ করতে চাইলে মানচিত্রের ওপর সেই বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিতবাহী ভাষা[illegible] স্বচ্ছ কাগজটি চেপে ধরলেই এক নজরে স্পষ্ট দেখা যায় সেই ভাষা-রেখ বিভিন্ন অঞ্চলকে কিভাবে বিভক্ত করেছে। যে পদ্ধতিতে ভেঙ্গুর তথ্য সংগ্রহ করেছেন তার একটা [illegible] স্পষ্ট। যেসব শিক্ষকেরা ভেঙ্গুরের বাক্যাবলী নিজেদের আঞ্চলিক জবানিতে তজমা করে পাঠান তারা কেউ ভাষাতত্ত্বে জ্ঞানী ছিলেন না। ধ্বনি ও বর্ণগত পার্থক্য তাদের জানা [illegible] না। ধ্বনির সূক্ষ্ম পার্থক্য তাদের কানে ধরা পড়া স্বাভাবিক ছিল না। হয়ত প্রচলিত লিখন পদ্ধতির কল হয়ে যা প্রকৃত উচ্চারণ নয় তাও লিখে থাকবেন।

ফরাসি ভাষাতত্ত্ববিদ এদঁগোর জরিপনীতি এ শেষোক্ত অনিশ্চয়তা থেকে অপেক্ষাকৃত মুক্ত। নিজে পেশাদার ভাষাতত্ত্ববিদ, নিজের পরিণত কান দিয়ে যে সব তারতম্য ধরতে পেরেছেন কেবলমাত্র সেগুলোকে ভিত্তি করেই মানচিত্রের ওপর ভাষারেখ টেনেছেন। স্বভাবতই একজনের পক্ষে বেশি বড় এলাকা তন্ন তন্ন করে ছেকে পরখ করা সাধ্যের বাইরে। এঁদমো দুহাজার শব্দ এবং বাক্যাংশের এক প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে একজন একজন করে বক্তার বুলি নিজ কানে বাজিয়ে ধ্বনিতত্ত্বের আদর্শ হরফে টুকে নিয়েছেন। পরে সবগুলোর মিল-অমিল অনুযায়ী মানচিত্রের প্রত্যেক বক্তা-পিছু একটিবার বিন্দুচিহ্ন এঁকেছেন। একই বৈশিষ্ট্যের প্রান্তিক বিন্দুমালা যোগ করে তৈরি হয়েছে এক একটি ভাষা-রেখ। বলা বাহুল্য পর্যবেক্ষণাধীন ব্যক্তির প্রতীক বিন্দুচিহ্ন আরো ঘন সন্নিবেশিত হলে এই গবেষণার ফলাফল আরো তাৎপর্যপূর্ণ হতো। যদিও পরীক্ষণীয় বুলির দৃষ্টান্ত ভেঙ্গুরের তুলনায় এখানে অনেক বেশি ছিল, কিন্তু সে বুলির কথক এ ক্ষেত্রে ছিল তুলনায় নগণ্য। তাছাড়া ভেঙ্গুর ভেদাভেদ যাচাই করেন সম্পূর্ণ বাক্যের মানদণ্ড আরোপ করে। এঁদমোর পুঁজি খণ্ডিত শব্দ বা বাক্যাংশ। উভয়ের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত মানচিত্র যে আদর্শ স্থানীয় হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

পূর্বপাকিস্তানের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার নমুনা আধুনিককালে সংগৃহীত হয়নি। প্রায় ষাট বছর আগে গ্রেয়ার্সন সাহেব তাঁর লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া গ্রন্থাবলীতে যে সংকলন রেখে গেছেন, আজও তা সব দিক থেকে অতুলনীয়। বাইবেলের অমিতব্যয়ী সন্তানের গৃহপ্রত্যাবর্তনের একই কাহিনীকে তিনি ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্রতি ক্ষুদে অঞ্চলের বক্তার ঘরোয়া বুলিতে তর্জমা করিয়ে নেন। সাধ্যমতো ধ্বনিতত্ত্বমূলক হরফে তার লিখিত রূপকে পরিশোধিত করেন। তারপর প্রতিটি দৃষ্টান্ত খুঁটিয়ে বিচার করে তার ধ্বনিগত ও ব্যাকরণগত সকল উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যকে সংক্ষেপে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। এই জাতীয় বর্ণনার ফলাফল সামনে রেখে তিনি বাংলা ভাষায় বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ যে সকল প্রধানভাগে বিভক্ত করেন তার পটভূমি ছিল সমগ্র বাংলাদেশ। যদিও আমাদের বিচার্য এলাকা পূর্ববঙ্গ বা পূর্বপাকিস্তান, আমরা গ্রেয়ার্সন সংগৃহীত উপাদানের ওপর নির্ভর করে কয়েকটি উল্লেখযোগ সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি। বলা বাহুল্য, আমাদের বক্তব্য বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিশ্লেষণরীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং সেই কারণে গ্রেয়ার্সনের নানা মীমাংসার সঙ্গে অনেক জায়গায় মিলবে না।

গোটা পূর্বপাকিস্তানের বাংলাকে মোটামুটি তিনটি প্রধান এলাকায় ও ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ক. চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, সিলেট। খ. কুমিল্লা, বরিশাল, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ। গ. বগুড়া, দিনাজপুর, যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, পাবনা, রাজশাহী, রংপুর। এই তিনটে প্রধান ভাগের মধ্যে দুটো নিতান্তই ছোট এলাকা আছে—যেখানকার ভাষা আশেপাশের ভাষা থেকে একেবারে আলাদা। এত আলাদা যে অনেকে মনে করতেন, এ দুটোর মধ্যে অন্তত একটা কিছুতে বাংলা বলে বিবেচিত হতে পারে না। একটা হলো ময়মনসিংহের হাজংদের ভাষা, দ্বিতীয়টি পাহাড়িয়া চট্টগ্রামের চাক্‌মাদের ভাষা। চাক্‌মাকে অনেকেই চিন-তিব্বতীয় ভাষার অন্তর্গতক বলে মনে করতেন। এখন অবশ্য ভাষাতত্ত্ববিদেরা সবাই স্বীকার করেন যে হাজং এবং চাকমা উভয়েই বাংলা ভাষার দুটো আঞ্চলিক রূপ মাত্র। হাজং পড়ে/খ/এলাকায়, চাক্‌মা/ক/এলাকায়।

যেভাবে ভাগ করা হয়েছে, তাতে /ক/এলাকা হলো পূর্বপাকিস্তানের পূর্বপ্রান্তীয় এবং /গ/ হলো পশ্চিম প্রান্তীয়, /খ/ মধ্যবর্তী আমরা ভাষারেক টেনেছি, লম্বালম্বিভাবে, উত্তর-দক্ষিণে। পশ্চিম খণ্ড পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে নিকটবর্তী। সেই হিসেবে পশ্চিমবঙ্গীয় (ভারত) বাংলা বা তার আদর্শ চলতি রূপের সঙ্গে এর পার্থক্য ন্যূনতম। বগুড়া, দিনাজপুর যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, পাবনা, রাজশাহী, রংপুরের কথা তুলনামূলকভাবে পূর্বপাকিস্তানের বৃহত্তর অঞ্চলের যত নিকটবর্তী তার চেয়ে তার ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়তা পশ্চিবঙ্গের বৃহত্তর এলাকার বাংলার সঙ্গে। পূর্বপাকিস্তানের মধ্যবর্তী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গ থেকে আরেকটু বেশি দূরে এবং সেই পরিমাণে আদর্শ কথ্যবুলি থেকে দূরে অবস্থিত। সবচেয়ে দূরে পূর্বপ্রান্তীয় /ক/ এলাকা যেখানকার অনেক ভাষারূপ এত পৃথক যে পশ্চিমবঙ্গের অনেক অঞ্চলে তা বোধগম্য নয়। নিজেদের মধ্যে বোধগম্যতার ভিত্তিতে এই তিন এলাকার পারস্পরিক সম্পর্ক ক্রমিক। /ক/ এলাকার বুলি /খ/ অঞ্চলে যতদূর বোঝা যাবে, /গ/ অঞ্চলে তার চেয়ে কম বোঝার আশঙ্কা, কোনো কোনো /ক/'র বুলি কোনো কোনো /গ/ অঞ্চলে আদৌ বোধগম্য নয়। বিপরীত দিক থেকে এই সম্পর্ক কিছুটা স্বতন্ত্র হতে পারে। অর্থাৎ /গ/'র লোক /খ/'কে, /খ/'র/ক/ কে যতটা বুজতে পারে, তার চেয়ে বেশি সম্ভবত /ক/'র লোক /খ/'কে, /খ/ র লোক /গ/'কে বুঝতে পারবে। পশ্চিমবঙ্গীয় বুলির সর্বজনস্বীকৃত আপেক্ষিক মর্যাদাই হয়তো এই প্রবণতার মূল কারণ।

এই তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত আঞ্চলিক ভাষাসমূহের মধ্যে ধ্বনিরূপগত পার্থক্য লক্ষণীয়। এ যে কেবল বর্ণের পারিবেশিক ধ্বনিরূপের বৈষম্য তা নয়। নিতান্ত সাধারণভাবেও এক অঞ্চলের এক বর্ণের বৃহত্তম সংখ্যক উচ্চারণ, অন্য অঞ্চলের একই বর্ণের বৃহত্তম সংখ্যক উচ্চারণের সঙ্গে তুল্যমূল্য হলেও রীতি ও অবস্থানের দিক থেকে একেবারে এক নয়। তাছাড়া বর্ণ এক হয়েও তার ধ্বনিরূপের বিক্ষেপ নানা অঞ্চলের নানা রকম।

পূর্বপাকিস্তানের একেবারে পশ্চিমপ্রান্তীয় এলাকা /গ/'র বর্ণমালা আদর্শ চলতি বাংলার সঙ্গে অভিন্ন, কিন্তু আদর্শ চলতি বাংলার সঙ্গে গোটা শব্দ ধরে ধরে তুলনা করলে কতগুলো ধ্বনিগত বৈষম্য বড় হয়ে দেখা দেয়। যেমন—

আদর্শ	/ক/ এলাকায়
/শ ও র ই র এ/	(শ ও র ই ল এ)
/প এ ট/	প এ্যা ট/
/ব অ ড় ও/	/ব অ ড় অ/

ব্যাখ্যা করার সুবিধার জন্য এ জাতীয় পার্থক্যকে আমরা শব্দগত পার্থক্য বলে উল্লেখ করব। /ক/ এলাকা সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে আদর্শ চলতিতে যেখানে /র/ /ক/ এ সেখানে /ল/ /এ 'র জায়গায় /এ্যা/ /ও/'র জায়গায় /অ/। দু'অঞ্চলেব দুটো শব্দের ধ্বনি এবং অর্থ উভয় দিক পাশাপাশি বেখে তুলনা করলে যদি কোনো আমূল বৈপরীত্য লক্ষ করা যায় তাহলে আমরা তাকে আর শব্দগত নয় বলে অর্থগত বৈষম্য হিসেবে উল্লেখ কবব। যেমন আদর্শ চলতি বুলিতে যা/ম এ এ/, হাজং (খ)-এ তা /ত ই ম আ ত/, চাক্‌মায় (ক) /ম ই ল আ। এমনও হতে পারে যে দু'অঞ্চলে একই উচ্চারণের দুটো শব্দ দুটো স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত হয় যা তাদের একাধিক দ্যোতনার মধ্যে কেবলমাত্র আংশিক মিল বিদ্যমান। আঞ্চলিক ভাষারূপের তুলনা করতে গিয়ে আমবা এর সবগুলোকেই অর্থগত পার্থক্য বলে উল্লেখ করব। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ধ্বনিরূপগত পার্থক্যই ব্যাপক, বর্ণগত পার্থক্য অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ, শব্দগত বৈষম্যের ছড়াছড়ি, কিন্তু অর্থগত বৈষম্য দু-একটা ক্ষুদ্র এলাকা বাদ দিলে সচরাচর দৃষ্ট হয় না। প্রসঙ্গত এইখানে আরো একটা কথা উল্লেখ করে রাখা ভালো। আমরা বারবারই আদর্শ চলতি বুলির দৃষ্টান্ত সামনে রেখে অন্য আঞ্চলিক বুলির তুলনামূলক মিল-অমিল বর্ণনা করছি। এ থেকে এমন সন্দেহ হতে পারে যে আদর্শ চলতি বুলির একটা আত্যন্তিক শ্রেষ্ঠতাকে আমরা স্বীকার করি অথবা মনে করি যে আদর্শ চলতিটা অপরিবর্তনীয় এবং প্রাচীনতর এবং সেজনই সেটাকে কষ্টিপাথর করে আমরা আর সব আঞ্চলিক রূপের বিচার করতে বসেছি। আমরা মোটেই সে-রকম মনে করি না। আদর্শ চলতিকে কেন্দ্র করে আমরা পার্থক্য বর্ণনা করছি কেবলমাত্র তুলনামূলক আলোচনাকে স্পষ্টতা দান করার জন্যে। আদর্শ চলতি ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো ভাষারূপকে মানদণ্ড করে অন্যান্য সকল ভাষারূপের বর্ণনা সমপরিমাণেই গ্রহণীয় হতো।

'খ' বা পূর্বপাকিস্তানের মধ্যবর্তী এলাকা নানা কারণে আজ সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী, প্রদেশের রাজধানী ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রবিন্দু ঢাকা এই এলাকায়। লোকসংখ্যার দিক থেকে এই অঞ্চল সংখ্যাগরিষ্ঠ। আদর্শ চলতি বুলির সঙ্গে পার্থক্য এখানে /ক/ এলাকার চেয়ে অনেকগুণ স্পষ্ট অথচ /ক/ এলাকার বুলির মতো নিজ এলাকার বাইরে তুলনীয়রূপে দুর্বোধ্য বা অবোধ্য নয়।

/খ/ এলাকার বর্ণমালা আদর্শ চলতি থেকে স্বতন্ত্র। /চ, ছ, স/, 'র বদলে /খ/ তে পাই কেবল /চ ছ/, /জ/'র বদলে। মহাপ্রাণ বর্ণ /খ/ এলাকায় নেই। হাম্‌জা আছে। মোটামুটি এই বৈশিষ্ট্যগুলো এই অঞ্চলের বেশির ভাগ লোকের জন্য সত্য।

শব্দগত বৈষম্যও কম নয়। আদর্শ চলতির শব্দের /ড় র/ পার্থক্য, /ও অ/ পার্থক্য এবং /এ্যা এ/ পার্থক্য এখানে হরদম ওলট-পালট হচ্ছে।

/ক/ হচ্ছে পূর্বপাকিস্তানের পূর্বপ্রান্তীয় এলাকা। /খ/ অঞ্চলের যে সব বর্ণগত বৈশিষ্ট্য আদর্শ চলতি থেকে তার বৈষম্য ঘোষণা করে, /ক/ অঞ্চলে সেগুলো আরো জাজ্বল্যমানরূপে বহুল প্রচলিত। তার ওপর /ক/'র রূপ এখানে বেশির ভাগ সময় [x] 'র মতো, /ফ/ [f] 'র মতো, /য়/ এবং হয়তো /ব/ এই অঞ্চলে স্বাধীন বর্ণ।

শব্দগত পার্থক্য ব্যাপকতর এবং অর্থগত পার্থক্যও অপেক্ষাকৃত বেশি দৃষ্ট হয়।

পূর্বপাকিস্তানের নানা অঞ্চলের বাংলার মধ্যে শব্দগঠনজান পার্থক্যটাই এক অর্থে সবচেয়ে বড়। তবে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে এই বিচ্যুতি রীতির নয়, রূপের। অর্থাৎ বাংলার শব্দগঠনরীতি সর্বাঞ্চলে প্রায় একই রকম। যে কোনো ক্রিয়াপদের গাঠনিক রূপ :

মূল + সাধন প্রত্যয় + কালবাচক বিভক্তি + ব্যক্তিবাচক বিভক্তি + আদেশ অনুরোধমূলক বিভক্তি। এই জাতীয়। এমনিভাবে বিশেষ্যের রূপ—

মূল +... ...

কিন্তু প্রতি প্রত্যয় বা বিভক্তির ধ্বনিগত চেহারা সকল অঞ্চলে এক নয়। পূর্বপাকিস্তানের তিন প্রধান অঞ্চলে এই গাঠনিক রূপের যে রকমফের লক্ষ করা যায় তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত মেলে—১. সর্বনামেব নানা পাদিক রূপে, ২. বিশেষ্যের সকল রকম বিভক্তিতে, ৩. ক্রিয়াপদের বিশেষ করে কালবাচক বিভক্তিতে। যেমন—আমি শব্দটা 'ক'তে মুই, নোয়াখালীতে 'আঁই' চাকমায় 'ময়'; 'আমার' কথাটা 'ক'তে 'মোর', হাজং-এ 'মা-লাগিক', চাকমা 'ম', নোয়াখালীতে 'আঁর'। 'আমাদের'—/গ/তে 'হামার', ময়মনসিংহে 'আমরার', বরিশালে 'মোগো', ঢাকায় 'মোগো', হাজং-এ 'আমালাক বেদে' নোয়াখালীতে/আঁরার/।

বিশেষ্যে—

আদর্শ	:	চাকরদের
ক'তে	:	চাওর গুণ
খ'তে	:	চাহরগো
গ'তে	:	চাকরদেরকে

ক্রিয়াপদে—

আদর্শ	:	বোলবো
ক	:	কৌয়ুম
খ	:	বোলমু
গ	:	বোলিম

এই রকম করে সমগ্র পূর্বপাকিস্তানের নানা অঞ্চলের বাংলা বুলির মধ্যে যে পার্থক্য তা স্পষ্ট করে বর্ণনা করা যেতে পারে। আমাদের বর্ণনা অবশ্য, স্থানাভাবহেতু অতিরিক্ত সরলীকৃত মোটামুটি ভাগ করে বড় বড় ছকে ফেলে যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়া হয়েছে তার পরতে পরতে আবো নানা বিচ্যুতি বর্ণিত হতে পাবত। তাছাড়া, অনেক অঞ্চলেই নিজস্ব আঞ্চলিক রূপের ব্যবহাব ছাড়া আদর্শ চলতির সংশ্লিষ্ট রূপগুলিও ব্যবহৃত হয় বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এ কথাগুলো মনে রেখেই পূর্বপাকিস্তানে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্য ও বিস্তার সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ ধারণা দৃষ্টান্তসহ তুলে হলো।

বাক্যগঠন রীতি

বর্ণ গেঁথে শব্দ তৈরি হয়। যেমন /বঅলও/। অবশ্য যেমন-তেমন কবে বাংলা বর্ণ পরপর জুড়ে গেলেই শব্দ তৈরি হতে থাকবে এমন নয়। কোন বর্ণের পর কোন বর্ণ বসতে পাবে সব ভাষাতেই তার একটা ধরাবাঁধা নিয়ম আছে। যেমন শব্দের শুরুতে /ং/ এবং শেষে /হ/ বাংলায় অসিদ্ধ। কেউ যদি কেবলমাত্র একটি বর্ণ উচ্চারণ করেই থেমে যায় তাহলেই বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের পরিসংখ্যানমূলক বিচারকে ভিত্তি করে অনুমান করা সম্ভব হয়, পববর্তী বর্ণটি কী হতে পারে তা। বলা বাহুল্য, পবিসংখ্যানমূলক বিচার কেবলমাত্র সম্ভাবনার ক্রমকে পরিমাপ করতে পারে, অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য এককের সন্ধান দেয় না। অর্থাৎ কোনো একটি বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছের আগে বা পরে কোনো কোনো বর্ণ কতখানি প্রত্যাশিত তা অতি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা যায়। বিশেষ ভাষার বহু সংখ্যক শব্দের বর্ণ সমাবেশ বিশ্লেষণ করে সেই ভাষার শব্দগত বর্ণমালার সংযোগ ধর্মকে জানা যায়। একই পদ্ধতিতে বহুসংখ্যক বাক্যের শব্দাবলী বিচার করে সেই ভাষায় বাক্যের অন্তর্গত শব্দামালার সংযোগ ধর্ম কী সে সম্পর্কে সাধারণ জন্যে। শব্দাবলীর এই সংযোগ ধর্মকেই আমরা বাক্যগঠন রীতি বলে অভিহিত করেছি।

ধ্বনি, বর্ণ ও শব্দেব আলোচনা যতখানি সম্পূর্ণতার সঙ্গে সম্পাদিত হয় বাক্য বিচার আধুনিক ভাষাতত্ত্বে এখনও সেবকম সন্তোষজনক বিশ্লেষণের আয়ত্তাধীন হয়নি। বাক্যগঠন বীতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলোও সে জন্যে অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট তত্ত্বগত ভিত্তির ওপব প্রতিষ্ঠিত। মোটামুটিভাবে দুটো মূল সূত্রকে আশ্রয় কবে বাক্যবিচার পুষ্টি লাভ করেছে। তাব একটা দিক হালে বাক্যের অন্তর্গত নানা আয়তনের অংশসমূহের মধ্যে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সম্পর্কে স্তর নির্ণয় করা। আরেকটা দিক হলো কোনো বাক্যাংশের গঠনকারী শব্দমালা কোনো কোনো ক্ষুদ্রক ক্ষুদ্রতর শব্দমণ্ডল বা একক শব্দ দ্বারা শব্দের সঙ্গে তুল্যমূল্যতার অনুসন্ধান করা। যে-কোনো একটি বাক্যের সকল শব্দ পরস্পরের সঙ্গে সমান গাঢ়ভাবে যুক্ত নয়। কোনোখানে যোগ খুবই নিবিড় আবার কোনোখানে ছেদ খুবই স্পষ্ট। যে বাক্যাংশের শব্দমণ্ডলীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত গভীর নৈকট্য সেই বাক্যাংশ সাধারণত ক্ষুদ্রক ক্ষুদ্রতর শব্দমালা বা একক শব্দ দ্বারা তুল্যমূল্য রূপে বিচ্যুত হতে পারে।